পরলোক-রহস্য

পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
[বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড]
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০১২

প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র, ১৩৪৮

শ্রীমণীন্দ্রলাল দত্ত কর্তৃক
বসুমতী প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত
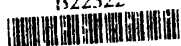
বিজ্ঞাপন

আমাদের মধ্যে অনেক লোক পরলোকের অস্তিত্বে সন্দিহান ও অনেক লোক দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ভ্রান্ত। সন্দেহ ও ভ্রান্তি উভয়ই যে অনিষ্টকর, তাহা বলা বাহুল্য। দিগ্‌ভ্রান্তি যেরূপ দুরপনেয়, সন্দেহ সেরূপ দুরপনেয় নহে। সন্দেহনিবৃত্তির বিবিধ পায় আছে, পরন্তু দিগ্‌ভ্রমনিবৃত্তির অদ্বিতীয় উপায় অভ্যাস বা অনুশীলন। গুরুজনের উপদেশ ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে সন্দেহনিবৃত্তি হয়, পরন্তু দিগ্‌ভ্রমনিবৃত্তি হয় না। দিগ্‌ভ্রমনিবৃত্তির জন্য কেবলমাত্র অভ্যাস বা অনুশীলন আবশ্যক। দেখা গিয়াছে, অনেক দিন অভ্যাসের পর অথবা অনুশীলনের পর দিগ্‌ভ্রমনিবৃত্তি হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে হয় নাই। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমার পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেব মনে করিয়াছিলেন, পারলৌকিক অস্তিত্বভ্রান্তিও অভ্যাস বা অনুশীলন ব্যতীত অন্য উপায়ে বিনিবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং অনুশীলনের উপযোগী কোন একটা বিশেষ অবলম্বন আবশ্যক। তদর্থে তিনি এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়নপূর্ব্বক প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল, এই ক্ষুদ্র পুস্তক পারলৌকিক অস্তিত্ব-চর্চ্চার একতম অবলম্বন হইবে।

-- শ্রীহরিপদ শর্ম্মণঃ

পাতনিকা

পরলোকসংক্রান্ত কোন কথা বলিতে হইলে, অথবা বুঝিতে হইলে, আগে ইহলোকের কতকগুলি কথা মনে করিতে হয়। পরে ইহলোকের সেই সেই কথার তুলনায় পরলোকের কথা বলিতে হয় এবং বুঝা আবশ্যক হইলেও সেই সেই কথার তুলনায় বুঝিতে হয়। নচেৎ বলাও সমঞ্জস হয় না এবং বুঝাও যথাযথ হয় না। মনে করুন—আমি আমার জন্ম দেখি নাই, তুমিও তোমার জন্ম দেখ নাই। তুমি তোমার মরণ দেখিবে না এবং আমিও আমার মরণ দেখিব না। অথচ কি তুমি, কি আমি, আমরা সকলেই আপন আপন জন্ম মরণ বুঝি ও বিশ্বাস করি। কিসে বুঝি ও কেন বিশ্বাস করি? অবশ্যই বলিতে হইবে যে, পরের জন্ম-মরণ দেখিয়া আমরা সকলেই আপন আপন জন্ম-মরণ বুঝি ও বিশ্বাস করি; এ বুঝা প্রত্যক্ষমূলক নহে, পরন্তু অনুমানমূলক। বিশ্বাসও প্রত্যক্ষের মহিমায় অবতরিত নহে, পরন্তু অনুমানের মহিমায়। ইহলোকের এই ব্যাপারটুকুর তুলনায়, আমরা বলি ও বুঝি যে, পরলোক না দেখিলেও আমরা অনুমানের দ্বারা পরলোক থাকা বিশ্বাস করিতে বাধ্য। এক স্থানে অনুমানে বিশ্বস্ত হইব ও অপর স্থানে অবিশ্বস্ত থাকিব—এ বুদ্ধি হঠকারিতারই অন্যতম অংশ।

আমাদের সম্মুখে শত শত লোক জন্মিতেছে ও শত শত লোক মরিতেছে। দেখিয়া দেখিয়া আমরা বুঝি ও বিশ্বাস

করি, আমরাও ঐরূপ জন্মিয়াছি ও ঐরূপ মরিব। এই বোধের ও বিশ্বাসের সঙ্গে আরও একটু অধিক বুঝা ও বিশ্বাস করা উচিত। সে অধিকটুকু এই যে, আমাদের সম্মুখে প্রত্যহ শত শত লোক পরলোক দেখিয়া ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে ও শত শত লোক পরলোক দেখিবার জন্য শরীররূপ গৃহ ছাড়িয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া আমাদের বুঝা ও বিশ্বাস করা উচিত যে, আমরাও পরলোকের ফেরৎ ও আমরাও একদিন না একদিন পুনঃ এই শরীররূপ গৃহ ত্যাগ করিয়া পরলোক দেখিতে যাইব। যাহারা জন্মিতেছে, তাহারা সকলেই পরলোকের ফেরৎ এবং যাহারা মরিতেছে, তাহারা সকলেই পরলোকযাত্রী। আমরা পরের জন্ম-মরণ-ব্যাপার উপর উপর দেখি, তন্ন তন্ন বুদ্ধি উত্থাপিত করিয়া দেখি না অর্থাৎ ভালরূপ তলাইয়া দেখি না, তাই আমরা জন্ম-মরণের স্থূল দৃশ্যটাই দেখি। তৎসংসৃষ্ট পরলোকগমনের ও পরলোকপ্রত্যাগমনের সূক্ষ্ম চিহ্নানুচিহ্ন দেখি না বা দেখিতে পাই না, দেখা দূরে থাক, দেখিবার চেষ্টা পর্য্যন্তও করি না। যাঁহারা চেষ্টা করেন, তাঁহারা সকলেই পরলোক-গমনের ও পরলোক-প্রত্যাগমনের নানাবিধ চিহ্ন দেখিতে পান এবং দেখিয়া বলেন, অনুমান করেন, এই নবাগত নর পরলোকের ফেরৎ ও এই বৃদ্ধ নর পরলোকের যাত্রী। পরলোকগমনের ও পরলোকপ্রত্যাগমনের চিহ্ন কি? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর যথাস্থানে অনুসন্ধেয়।

ইহলোকের আর একটি ব্যাপার মনে করিতে হইবে। ব্যাপারটির নাম অভিপ্রায়-বিজ্ঞাপন। অভিপ্রায়-বিজ্ঞাপন-

ব্যাপার ইহলোকবাসীদিগের মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই চলিতেছে, একমুহূর্ত্তের জন্যও স্থগিত নাই। আমি যেমন আমার অন্তরস্থ অভিপ্রায় অর্থাৎ জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি তোমাকে বিজ্ঞাপিত করিতেছি, তেমনি তুমিও তোমার অন্তরস্থ অভিপ্রায় আমাতে বিজ্ঞাপিত করিতেছ। বলা বাহুল্য যে, প্রাণিমাত্রেই প্রোক্ত অভিপ্রায়-বিজ্ঞাপন-নিয়মের অধীন।

অভিপ্রায়-বিজ্ঞাপনের দুইটিমাত্র দ্বার বা উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে;—ইঙ্গিত ও ভাষা। তন্মধ্যে বাক্‌শক্তিবর্জ্জিত জীবেরা ইঙ্গিতাবলম্বী ও বাক্‌শক্তিমান্ মনুষ্য-জীবেরা ইঙ্গিত ও ভাষা উভয়াবলম্বী। ইহারা ইঙ্গিতের দ্বারাও অভিপ্রায়-বিজ্ঞাপন করে, ভাষার দ্বারাও করে, তথা ইঙ্গিত ও ভাষা উভয় যোগেও করে। ভাষা যতক্ষণ ধ্বনিময় অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ তাহা বাক্য এবং সঙ্কেত-নির্ম্মিত অক্ষররশিস্মে আবদ্ধ হইলে তাহা লিপি। কোন স্বজন আমার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "অমুক অমুক স্থানে আপনার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন", এই ধ্বনিময় ভাষাটি বাক্য এবং ইহা লিখিয়া পাঠাইলে লিপি। প্রতিটি মুহূর্ত্তেই এই লিপি ও বাক্য উভয় ভাষা আমাদের জ্ঞান-জন্মের কারণ হইতেছে এবং সে জ্ঞান আমাদের নিকট সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। ডাক্তার উইল্‌স্ সাহেব লিখিয়া রাখিলেন, "আমি পরলোকে গিয়াছিলাম, কোন বাধাবশতঃ আবার ফিরিয়া আসিয়াছি।" লেখা পড়িয়া আমরাও জানিলাম ও বিশ্বাস করিলাম, উইল্‌স্ সাহেব পরলোক দেখিয়া ফিরিয়া

আসিয়াছেন। এইরূপ ব্যাসদেবও লিখিলেন, "সত্যবান্ পরলোকগমন করিলেন এবং সাবিত্রীর বাধায় পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন।" ব্যাসের লেখা পড়িলেও সত্যবানের পরলোক যাওয়া ও তথা হইতে ফিরিয়া আসা প্রতীত হয় ও ব্যক্তি-বিশেষের নিকট তাহা সত্য বলিয়াও প্রতীয়মান হয়। পুরাণ-লিখিত সত্যবানের কথা যেমন ষট্‌সংবাদযুক্ত বলিয়া প্রমাণ, তেমনি উইল্‌স্ সাহেবের পরলোকগমন-কথাও ষট্‌সংবাদযুক্ত বলিয়া প্রমাণ। সত্যবান্ পরলোকগত হইলেন, সাবিত্রী তাহা দেখিলেন, ব্যাস তাহা বলিলেন, গণেশ তাহা লিপিবদ্ধ করিলেন, বৈশম্পায়ন তাহা প্রচার করিলেন, অবশেষে সৌতিমুনি নৈমিষারণ্যে তাহার অনুপ্রচার করিলেন। উইল্‌সের পরলোকগমন-কথাও ঠিক এইরূপ। ডাক্তার উইল্‌স্ পরলোক গেলেন, তদীয় চিকিৎসক ডাক্তার তাহা দেখিলেন, প্রত্যাগত উইল্‌স্ তাহা লিপিবদ্ধ করিলেন, তদীয় চিকিৎসক ডাক্তার তাহার সাক্ষ্য দিলেন, Review of Reviews পত্রিকার সম্পাদক তাহার প্রচার করিলেন, অবশেষে উপাসনা পত্রিকা তাহার অনুপ্রচার করিলেন। ষট্‌সংবাদযুক্ত এই কথার ও এতদনুরূপ অন্য কথার তুলনায় পরলোক-কথা বলিতে ও বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ শাস্ত্রের ও বিশ্বস্ত মনুষ্যের কথা মানিয়া লইয়া পরলোক-কথা বলিতে ও বুঝিতে হইবে।

কথা মানি কেন? বিশ্বাস করি কেন? তাহাও বলিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরকীয় প্রত্যক্ষ-প্রভৃতি বিবিধ জ্ঞান তদীয় কথাবাহী হইয়া শ্রোতার অন্তরে আবিষ্ট হয়,

সেইজন্য কথাশ্রবণজনিত জ্ঞান প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষাদি বলিয়া গণ্য। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষের প্রভেদ কি? ভাবিয়া দেখিলে ফলে প্রভেদ নাই বলিয়া স্থির হইবে। কেন না, যাহা বক্তার প্রত্যক্ষ, তাহাই শ্রোতার পরোক্ষ। অতএব বাক্যশ্রবণজনিত জ্ঞান প্রত্যক্ষের ন্যায় মান্য ও বিশ্বাস্য। তবে যদি বক্তার কোন দোষ থাকে, বক্তা যদি ভ্রান্ত হয়, প্রমত্ত হয়, প্রতারক হয়, বিকলেন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে তদীয় বাক্য অসত্য, অমান্য ও অবিশ্বাস্য বলিয়া স্থির হইবে। যাহারা লোক ভুলাইবার জন্য অথবা কোনরূপ স্বার্থসাধনের জন্য অননুভূত বিষয় বলে বা প্রচার করে, যাহারা যথাযথ জ্ঞান অর্জ্জন না করিয়া কথা বলে, প্রকৃত কথা গোপন করিয়া অপ্রকৃত কথা উচ্চারণ করে, তাহাদের কথা অপ্রমাণ, তদ্ব্যতীত কথা প্রমাণ, ইহা প্রমাণবিৎ পণ্ডিত-দিগের সর্ব্বোচ্চ ঘোষণা। তাঁহাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, ভ্রমপ্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব (করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপাটব অর্থাৎ অপটুতা) এই দোষচতুষ্টয়-বর্জ্জিত মহাপুরুষগণ আপ্ত সংজ্ঞার সঙ্গী। তাঁহাদের বাক্য আপ্ত, বা আপ্তবাক্য; এই আপ্তবাক্য সর্ব্বদা প্রমাণ, কদাচিৎ ও কুত্রাপি অপ্রমাণ নহে। আপ্তবাক্যের ও আপ্তলিপির প্রামাণ্য ঐরূপেই অবধারণ করা হয়। এই বিষয়ে পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের অপর এক সিদ্ধান্ত এই যে, অনুমান, উপমান, ভাষা, ঐতিহ্য প্রভৃতি প্রমাণসমূহের উত্থান ও পর্য্যবসান দুই-ই প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে অবস্থিত। প্রত্যক্ষ হইতেই অনুমানাদির উত্থান হয়,—অবশেষে প্রত্যক্ষে গিয়া সে সকলের প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। প্রাগুক্ত বক্তা দেখিয়া

আসিয়া আমাকে পথি দণ্ডায়মান ব্যক্তির কথা বলিয়াছেন, আমিও সেই আপ্তবাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমনকরতঃ বক্তার দৃষ্ট দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম। সুতরাং বুঝা গেল, ঐ বাক্যের উত্থানও প্রত্যক্ষে এবং উহার প্রামাণ্য-নিশ্চয়ও প্রত্যক্ষে। এইরূপে প্রত্যক্ষ হইতেই প্রমাণান্তরের উত্থান ও পর্য্যবসান অবধারণ করা হয়, এবং বলাও হয় যে,—যে প্রমাণ প্রত্যক্ষে পর্য্যবসিত না হয় সে প্রমাণ প্রমাণ নহে, পরন্তু প্রমাণাভাস। অনেকেই বলেন যে, নাস্তিকেরা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী; তাঁহারা অনুমানাদি প্রমাণ মানেন না। বস্তুতঃ তাহা নহে। তাঁহারাও অনুমান, উপমান, শব্দ সমুদায় প্রমাণ মান্য করেন; পরন্তু সে সকলের স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য স্বীকার করেন না। তাঁহাদেরও কথা—যে-সকল অনুমানাদি প্রত্যক্ষমূলক ও প্রত্যক্ষ পর্য্যবসায়ী না হয়, সে সকল অপ্রমাণ; অন্যথা তাঁহাদের মধ্যে সেই সেই প্রকারের গুরু-শিষ্য ব্যবহার প্রচলিত থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবে যে আস্তিকেরা তাঁহাদিগকে নিন্দা করেন, তৎপ্রতি অন্য কারণ আছে; সে অন্য কারণ—মূল বিষয়ের ভ্রান্তি। মূল প্রত্যক্ষ, সেই প্রত্যক্ষেই তাঁহাদের একপ্রকার ভ্রম আছে। ধ্যানপ্রবাহের পরিপাকে একপ্রকার প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান জন্মে। কোন কোন মহাপুরুষের চিত্তে সহসা একপ্রকার প্রতিভানামক প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। স্বপ্নাদেশ ও প্রত্যাদেশ নামধেয় অন্য একপ্রকার প্রত্যক্ষ-জ্ঞানও জন্মিয়া থাকে। এই সকল প্রত্যক্ষে তাঁহারা ভ্রান্ত। ভ্রান্তির কারণ, ঐ সকল প্রত্যক্ষের অনেকানেক বিষয় সাধারণ প্রত্যক্ষের

অধিকার-বহির্ভূত। কাজেই তাঁহারা তাঁহাদের বাক্যকে প্রত্যক্ষপর্য্যবসায়ী হইতে দেখেন না। না দেখিয়াই বলেন, স্বর্গ, অমৃত, অপ্সরা, পরলোক প্রভৃতি অলীক, পরন্তু যাঁহাদের তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত, তাঁহারা দেখেন, ঐ সকল সত্য, অর্থাৎ ঐ সকল সাধারণ প্রত্যক্ষের গোচর না হইলেও, প্রাগুক্ত অসাধারণ প্রত্যক্ষের গোচর। এই সকল সামঞ্জস্যময়ী বাণী স্মরণ রাখিয়া, আর্যবিজ্ঞানে পরিপূর্ণ উপনিষদাদি শাস্ত্ররাশির আলোচনাকরতঃ পারলৌকিক বিষয় বলিলে ও বুঝিলে ঠিক বলা ও ঠিক বুঝা হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

এই স্থানে আর একটি কথা বলিয়া পাতনিকা প্রস্তাব শেষ করি। অনেকের পরলোক নাই বলিয়া ভ্রম আছে, তাঁহাদের সেই ভ্রম দিগ্‌ভ্রমের ন্যায় দুরপনেয়। অন্য ভ্রম সহজে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু দিগ্‌ভ্রম সহজে যায় না অর্থাৎ আপনা আপনি নিবৃত্ত না হইলে, যুক্তি-তর্কাদির দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। চক্ষে দেখিতেছি—সূর্য্য উঠিতেছে; যুক্তিতেও পাইতেছি—পূর্ব্ব ভিন্ন অন্যদিকে সূর্য্যোদয় হয় না; লোকও বলিতেছে, এইটা পূর্ব্বদিক্; তথাপি মন সে দিক্‌টাকে পূর্ব্ব বলিয়া মানিতে চাহে না। স্পষ্ট দেখা যায়, বহুকাল অভ্যাসের পর, ঐ ভ্রম আপনা আপনি বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। যত্তৎক্ষণাৎ প্রমাণাদির দ্বারা বিনিবৃত্ত হয় না। পরলোক নাই, এ ভ্রমকেও দিগ্‌ভ্রমের দৃষ্টান্তে ঐরূপ অভ্যাসাপনেয় বলিয়া স্থির করিতে হইবে এবং অভ্যাসের অবলম্বনরূপে যুক্তি-তর্ক-প্রমাণাদি পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। যে-সকল প্রমাণ ও যুক্তি পরলোকজ্ঞানের জন্য আলোচনা করিতে হয়, সেই সকল যুক্তি ও প্রমাণ এই লিখ্যমাণ পরলোকরহস্য পুস্তকের বিষয়।

পরলোক-রহস্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

পুস্তকের নামকরণে 'রহস্য' শব্দের প্রয়োগ করিলাম সত্য ; পরন্তু রহস্যতাবর্ণন পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। অনেক লোকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা বলেন, "পরলোক" এই কথা একটি প্রহেলিকা, অর্থাৎ অর্থ বুঝা ভার। আমি এই মতেরই অনুবাদ করিয়া পুস্তকের নামাঙ্গে রহস্য শব্দ যোজিত করিলাম। নিজ মতে বলিতে গেলে বলিতে হয়, পরলোক রহস্য নহে, পরলোক প্রকাশ্য। পরলোক ব্যক্তিবিশেষের নিকট রহস্য বলিয়া প্রতিভাত হয় হউক ; পরন্তু ব্যক্তিবিশেষের নিকট উহা প্রকাশ্য। অথবা পরলোক প্রকাশযোগ্য কালের পূর্ব্বে রহস্য, পরন্তু প্রকাশযোগ্য কাল আগতে প্রকাশ্য। পরলোক কেন, ভাবিয়া দেখিলে সমুদয় পদার্থ প্রকাশযোগ্য কালের পূর্ব্বে রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পরলোক যে প্রক্রিয়ার প্রকাশযোগ্য কালে প্রকাশপ্রাপ্ত হয়, সেই প্রক্রিয়া বর্ণন করাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। রহস্য বর্ণন করা উদ্দেশ্য নহে। ফলতঃ পরলোক কথার অর্থ অতীব বিস্পষ্ট। যেমন ইহলোক শব্দের অর্থ বিস্পষ্ট, তেমনি পরলোক শব্দের অর্থও বিস্পষ্ট। ব্যবহার অনুসন্ধান করিলেই উক্ত উভয় শব্দেরই বিস্পষ্টার্থতা প্রতিপন্ন হইবে।

ইহলোক ও পরলোক শব্দের অর্থ

যাবৎ আমরা জীবিত, তাবৎ আমাদের ইহলোক। ইহলোকের অবসানে মৃত্যু, তৎপরে পরলোক। ইহাই আমাদের ইহলোক পরলোক কথার ব্যবহারসিদ্ধ অর্থ।

পরলোক-বিপ্রতিপত্তি

ইহলোকের শেষপ্রান্তে মৃত্যু, এ অংশ নির্ব্বিবাদ। পরন্তু মৃত্যুর পরেই পরলোক, এ অংশ নির্ব্বিবাদ নহে। যে যেমন বুঝে, সে ঐ অংশের সেইরূপ ব্যাখ্যাই করে, সেইজন্যই অতি প্রাচীনকাল হইতে ঐ অংশ লইয়া নানা মত, নানা তর্ক-বিতর্ক উত্থাপিত হইয়া অদ্য যাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে চলিয়া আসিতেছে। তত পুরাতন বৈদিক উপনিষৎকাণ্ডেও পরলোকঘটিত তাৎকালিক মতামত অনূদিত হইতে দেখা যায়। যথা—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে,
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহম্,
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥"

নচিকেতা নামক এক ঋষিবালক মৃত্যুদেব যমের নিকট বর চাহিতেছেন। বলিলেন, 'হে মৃত্যো! কেহ কেহ বলে, মনুষ্য মরিলেও থাকে অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও থাকে। আবার অন্যে বলে, না, থাকে না অর্থাৎ মৃত্যুই শেষ। যাহা এই বিষয়ের প্রকৃত তথ্য, তাহাই আমি আপনার অনুশাসনে জানিতে চাহি। ইহাই আমার তৃতীয় বর।'

মৃত্যু এই প্রার্থনার বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই—

"দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা,
ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ,
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্॥"

"হে নচিকেতঃ। পূর্ব্বে এই বিষয়ে দেবতারাও সন্দিগ্ধ ছিলেন। উহা সুজ্ঞেয় নহে অর্থাৎ উহা নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য, সহজে ও সকলের বুঝিবার জিনিস নহে। (তুমি বালক উহা বুঝিতে পারিবে না)। হে নচিকেতঃ। তুমি এ বর ত্যাগ করিয়া অন্য বর প্রার্থনা কর, ঐ বরের আগ্রহ পরিত্যাগ কর ও উহা জানিবার জন্য আমাকে উপরুদ্ধ করিও না।"

পরলোক দুর্ব্বোধ্য কেন? তাহা আলোচনা করিলে বুঝা যায়। আলোচনায় পাওয়া যায়, যাহা যাহা দেখিবার, শুনিবার, স্পর্শ ও স্বাদ গ্রহণ করিবার জিনিস নহে, তাহা তাহাই দুর্ব্বোধ্য; অর্থাৎ সহজে ও সকলে বুঝিতে পারে না। পরলোক দেখিবার, শুনিবার, স্পর্শ ও স্বাদগ্রহণ করিবার জিনিস নহে। সুতরাং পরলোক দুর্ব্বোধ্য। আকাশ তদ্রূপ পদার্থ বলিয়াই আকাশের স্বরূপ অববোধে নানা মতামত। কেহ বুঝেন ও বলেন, আকাশ কোন পদার্থ নহে; শূন্য অর্থাৎ অভাবাত্মক (নাই)*। আবার অন্যে বুঝেন ও বলেন, আকাশ একপ্রকার পদার্থ, দ্রব্য ও ভাবপদার্থ। আকাশের স্বরূপ

অববোধে যেরূপ মতামত, পরলোকেরও স্বরূপ অববোধে সেইরূপ মতামত বোদ্ধৃগণের বুদ্ধিবিকল্প হইতে সমুত্থিত হয়।

পরলোক দুর্ব্বোধ্যতার অপর কারণ,—পরলোক ভবিষ্যৎ; পরে কি হইবে, তাহা বুঝা অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য। যদিও কেহ কেহ অংশতঃ ভবিষ্যৎ বুঝেন, তথাপি সাধারণতঃ বলিতে গেলে, অনেকেই বুঝেন না। এই কথা বলাই উচিত ও সঙ্গত। এতদনুসারেও আমরা বুঝিতে পারি, প্রোক্ত কারণে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বলিয়া পরলোকবিষয়ে কেহ বুঝেন অস্তি, কেহ বা বুঝেন নাস্তি, এইজন্যই প্রথমে বলা হইয়াছে, পরলোক ব্যক্তিবিশেষের নিকট রহস্য ও ব্যক্তিবিশেষের নিকট প্রকাশ্য। অপিচ, সুবোধ্য ও দুর্ব্বোধ্য এই দুইটি শব্দ কোনও বস্তুধর্ম্মের বাচক নহে। কেননা, বস্তু একই, অথচ তাহা কাহারও নিকট দুর্ব্বোধ্য, কাহারও নিকট সুবোধ্য। আমি যাহাকে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া জানি, তুমি তাহাকে সুবোধ্য বলিয়া জান এবং আমি যাহাকে সুবোধ্য বলিয়া বর্ণনা করি, তুমি তাহাকে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বর্ণনা কর। অতএব সুবোধ্য ও দুর্ব্বোধ্য শব্দ বস্তুগুণের বাচক নহে, কেবলমাত্র আপেক্ষিক বুদ্ধিব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয়। আপেক্ষিক বুদ্ধিব্যবস্থারও কারণ এইরূপে বর্ণিত হইতে পারে।

বিষয়োপলব্ধির জন্য আমাদের শরীরে যে সকল করণ উদকরণ বিদ্যমান আছে, সে সকলকে আমরা ইন্দ্রিয় বলি।

এই ইন্দ্রিয়, সকলের সমান ও সমশক্তিশালী নহে। প্রত্যেক শরীরের অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহিরিন্দ্রিয় ন্যূনাতিরেক

শক্তিবিশিষ্ট। সেই জন্য সকলে সকল বিষয় সমান বা একরূপ বুঝে না, একরূপ দেখে না, একরূপ শুনে না। বিভিন্নরূপই বুঝে। কাহারও কাহারও শ্রবণশক্তি খুব প্রখর ও খুব পরিষ্কার। সেইরূপ দর্শনশক্তিও কোন কোন লোকের অতি তীব্র ও অতি পরিষ্কার। যাহাদের ইন্দ্রিয়গণ প্রখর ও পরিষ্কার, তাহারা যেরূপ দেখে, শুনে, যেরূপ বুঝে,—যাহাদের ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষাকৃত মৃদু ও মলিন, তাহারা সেরূপ দেখে না, সেরূপ শুনে না ও সেরূপ বুঝে না। শ্রবণশক্তির চরম ন্যূনতায় বাধির্য্য এবং দর্শনশক্তির চরম ন্যূনতায় আন্ধ্য; এ তত্ত্ব সকলেই বিদিত আছেন। আমরা এমন অনেক লোক দেখিয়াছি, যাহারা চিরকাল গান করিতেছে, অথচ সুরবোধ নাই। আবার এমন সকল ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা দশ-পাঁচ দিন মাত্র গান চর্চ্চা করিয়া সুরবোধের অধিকারী হন। তাই আমরা বলিতে ইচ্ছুক যে, কান সকলের সমান নহে, চক্ষুও সকলের সমান নহে। বোধের উপকরণ অন্তরিন্দ্রিয়ও সমান নহে। সেইজন্য শব্দব্রহ্মেরও কালমাত্রাদির সূক্ষ্ম তারতম্য বুঝিতে সকলে সমান পারগ হন না। বর্ত্তমানকালের ডাক্তারেরা সকলেই Stethoscope যন্ত্র ব্যবহার করেন বটে; কিন্তু তাহার ফল সকলে সমান আয়ত্ত করিতে পারেন না। যাঁহার শ্রবণশক্তি পরিষ্কার ও প্রখর, তিনি রোগীর পৃষ্ঠ, বক্ষ, পার্শ্ব প্রভৃতির অন্তর্গত শব্দের সূক্ষ্ম তারতম্য বুঝিবার অধিকারী হন; অন্যে তাহাতে অনধিকারী বা অব্যুৎপন্ন থাকেন। এইরূপ দর্শনশক্তির ব্যতিক্রমের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

একপ্রকার চক্ষুরোগ আছে, সে রোগে মানুষ এক রঙে অন্য রং দেখে। শুনা গিয়াছে, একজন ঐ রোগের রোগী এক রেলগাড়ীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রমাদ ঘটাইয়াছিল। মহাভারতের লিখিত কদ্রু-বিনতার পণও উক্ত রোগমূলক। কদ্রু দূর হইতে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব দেখিয়া বলিয়াছিলেন, উচ্চৈঃশ্রবা কালো এবং বিনতা সেই স্থানে থাকিয়াই বলিয়াছিলেন, উচ্চৈঃশ্রবা শাদা। এরূপ বৈপরীত্য-দর্শন রোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই রোগের নাম ইংরাজী ভাষায় Colour-blind (কলার ব্লাইণ্ড্) অর্থাৎ রংকাণা। আমাদের দেশে এই রোগের সংস্কৃত নাম ইন্দ্রিয়বধ অর্থাৎ তাহাদের স্বকার্য্যে অশক্তি। এই তথ্য সাংখ্যকারিকায় বর্ণিত আছে। যাঁহারা এই তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিবেন, যখন সামান্য একটা রঙে বৈপরীত্যবোধ হয়, তখন যে দুর্ব্বোধ্যতম পারলৌকিক বিষয়ে তাদৃশ বিপরীত-বোধ জন্মিবে, তাহা অসম্ভব নহে। যে শ্রেণীর লোকের নিকট পরলোক প্রতিভাত হয় না,—মৃত্যুদেব যম, নচিকেতাকে সেই শ্রেণীর লোকের কথা দুই তিনটি শ্লোকে উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহার একটি শ্লোক এই—

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং,
প্রমাদ্যন্তং চিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী,
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥"

যাহারা বিবেকনিষ্ঠ নহে, সর্ব্বদা প্রমত্ত, মোহগ্রস্ত অর্থাৎ

সর্ব্বদা বিষয়াসক্ত, তাহারা পরলোক বুঝিতে পারে না। তাহারা মনে করে, পরলোক আবার কি? ইহলোকই আছে, পরলোক নাই। এই ইহলোকাভিমানী মনুষ্যেরা পুনঃ পুনঃ আমার বশ্য হয়। ইহাই যমবচনের তাৎপর্য্যার্থ।

ইন্দ্রিয়ারাম দেহাত্মবাদীদিগের মন পরলোক বুঝিতে অক্ষম। পরলোক কেন,—ইহলোকেরও অনেক সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে অক্ষম। ইহাদের মনে—শরীর, ইন্দ্রিয় ও ভোগ্য বিষয় লইয়াই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত ও ব্যাসক্ত অবস্থায় অবস্থান করে; সেই কারণে ইহাদের মনে পরলোকবিষয়ক-প্রমাদজনিত নির্ম্মল সত্যজ্ঞান জন্মে না। মন যে বিষয়ে একাগ্র হয়, সে বিষয় তাহাদের নিকট স্ফূর্ত্তি পায় এবং যে বিষয়ে একাগ্র না হয়, সে বিষয় স্ফূর্ত্তি পায় না। মনের এই স্বভাবশক্তি বা স্বধর্ম্ম, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই নিকট পরিচিত রহিয়াছে। তাই বলা হইল, যাহারা একাগ্র হইয়া পরলোকচিন্তা করে না, করিবার অবসরও পায় না, কেবল ইহলোক লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকে, পরলোক সে সকল লোকের মনে স্থানপ্রাপ্ত হয় না। যদিও কদাচিৎ স্থানপ্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহা রূঢ় বা স্থায়ী হয় না। পদ্মপত্রনিপতিত জলের ন্যায় তৎক্ষণাৎ সরিয়া যায়। কাজেই তাহারা পরলোক আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যবস্থা

বিশ্বাস হয় না, সুতরাং নাই; আর বিশ্বাস হয়, সুতরাং আছে,—এ ব্যবস্থা ভাল ব্যবস্থা নহে, অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত নহে।

কারণ এই যে, বিশ্বাস অবিশ্বাস প্রমাণ নহে অর্থাৎ সত্য-মিথ্যা-নির্ণয়ের উপায় নহে। বুঝিলে বিশ্বাস, না বুঝিলে অবিশ্বাস, —ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস অবিশ্বাস কথার স্থূল অর্থ বা সংক্ষেপ ব্যাখ্যা। যেহেতু প্রমাণ নহে, সেই হেতু বিশ্বাসও পরিবর্ত্তনশীল, অবিশ্বাসও পরিবর্ত্তনশীল। এরূপ স্থল অনেক আছে, যে সকল স্থলে, বিশ্বাস অবিশ্বাসে এবং অবিশ্বাস বিশ্বাসে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। যাহারা বা যে দেশের লোকেরা চিরকাল বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে—পৃথিবী স্থিরা, সেই সকল লোকেরা আজ বিশ্বাস করিতেছে—পৃথিবী নিরন্তর অপরিমেয় বেগে ঘুরিতেছে। তাই আমরা বলি, বিশ্বাস অবিশ্বাস নিজে কোন প্রমাণ নহে। তবে যদি প্রমাণমূলক হয়, তাহা হইলে বিশ্বাস-অবিশ্বাস দুই-ই প্রমাণবৎ সত্যনির্ণায়ক হইতে পারে। আজকালকার সূর্য্যকেন্দ্রকে পৃথিবী-ভ্রমণের বিশ্বাস প্রমাণমূলক। সেই জন্য উহা চিরকাল অপরিবর্ত্তিত, রূঢ় বা দৃঢ় থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়। সিদ্ধান্ত কথা এই যে, প্রমাণমূলক বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস; তদ্ভিন্ন বিশ্বাসই অর্থাৎ আবুদ্ধিজনিত বিশ্বাস পণ্ড বিশ্বাস। এইরূপ প্রমাণমূলক বিশ্বাসও অবিশ্বাস, তদ্ভিন্ন অবিশ্বাস পণ্ড অবিশ্বাস।

কিরূপ বিশ্বাস প্রমাণমূলক ?

অস্তি-পক্ষীয় বিশ্বাস প্রমাণমূলক, কি নাস্তি-পক্ষীয় বিশ্বাস প্রমাণমূলক ? অনুসন্ধানে পাওয়া যায়, পরলোকে অবিশ্বাসের মূলে কোন প্রমাণ নাই। ঐ জ্ঞান বা ঐ বিশ্বাস কোন প্রমাণ

দ্বারা উৎপাদিত ও স্থাপিত হয় নাই। প্রতীত হয় না, দেখা যায় না, অথবা বুঝা যায় না, এতাবন্মাত্র কারণে ঐ জ্ঞান বা ঐ বিশ্বাস জন্মে; সেই জন্য উহা নিষ্প্রমাণ। এমন অনেক পদার্থ আছে, যাহা প্রথমতঃ প্রতীত হয় না, দেখা যায় না, বুঝা যায় না, অথচ প্রমাণ তাহাতে স্পষ্টতঃ আছে বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। পৃথিবী ঘুরিতেছে, এই তথ্যটুকু প্রথমতঃ বুঝা যায় না; কিন্তু প্রমাণ উহাকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দেয়। ব্যবহারতঃ দেখা যায়, নাস্তিবাদী লোক নাই বলিয়া বসিয়া থাকে, আর অস্তিবাদী লোক প্রমাণ খুঁজিয়া বেড়ায়। এই ব্যবহারটি ঠিক আজকালকার রাজকীয় ব্যবস্থার অনুরূপ। আজকালকার রাজকীয় বিচারালয়ের ব্যবস্থা এই যে, যে বলিবে, আমি টাকা ধারি না, তাহার কোন প্রমাণ দিতে হইবে না। কিন্তু যে বলিবে, অমুক আমার টাকা ধারে, দেয় না, প্রমাণের ভার তাহারই উপরে পড়িবে। এইরূপ যাঁহারা বলেন, পরলোক নাই, তাঁহারা কোন প্রমাণ দেখান না। কিন্তু যাঁহারা বলেন, পরলোক আছে, তাঁহারা প্রমাণ দেখাইতে বাধ্য। অস্তিবাদীরা বাধ্য হইয়া যে-সকল প্রমাণের কথা বলেন, সে সকল প্রমাণ যথাযথরূপে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করা গেল।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রত্যক্ষ প্রমাণ

প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। সেই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরলোক-সত্তা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ। বলা বাহুল্য যে, পরলোক জীবমাত্রেরই প্রত্যক্ষ। প্রত্যেক জীবই যথাকালে আপন আপন পরলোক দেখিতে পায়। 'পরলোক প্রত্যক্ষ' কথাটি আশ্চর্য্যজনক সত্য; পরন্তু প্রলাপ নহে। কেন প্রলাপ নহে, তাহা ক্রমে বুঝা যাইবে।

পরলোক-প্রতিপাদক প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ নহে, কিন্তু মানস। ঘট, পট, গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতি বিষয়ক যেরূপ, পরলোকবিষয়ক প্রত্যক্ষ সেরূপ নহে। সুখ-দুঃখ, বেদনা ও স্বপ্নাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষ যেরূপ, পরলোক-প্রত্যক্ষ ঠিক সেইরূপ। অথবা পরলোক-প্রত্যক্ষ স্বপ্ন প্রত্যক্ষের ন্যায় কেবলমাত্র মানস। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইলে জীব যে কেবলমাত্র পূর্ব্ব-সংস্কারের প্রবাহে মনের দ্বারা বিষয়-সন্দর্শন করে, সেই বিষয়-সন্দর্শনকে আমরা স্বপ্ন সংজ্ঞায় অভিহিত করি। কেন না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ঐ সময়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বা সুপ্তকল্প হইয়া থাকে। জীবের এই স্বপ্নদর্শনের প্রণালী, পরলোক-দর্শনের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। কেন না, পরলোকও ইন্দ্রিয়-বিলোপ-দশায় কেবলমাত্র মনের দ্বারা জীব কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়। যাঁহারা বলিবেন, কৈ পরলোক? দেখাও দেখি? তাঁহাদের প্রতি

আমার বক্তব্য এই যে, একের পরলোক অপরে দেখিতে পায় না। কেহ দেখাইতেও পারে না। যেমন একের স্বপ্ন অপরে দেখিতে পায় না,—যার স্বপ্ন, সেই দেখে, সেইরূপ একের পরলোক অপরে দেখিতে পায় না। কেহ কাহাকেও দেখাইতে পারে না। যার পরলোক, সেই দেখে। অন্যে তাহা দেখিবার ও দেখাইবার অধিকারী নহে। এই যে সম্মুখে একটি লোক নিদ্রিত, তুমি কি বলিতে পার যে, ঐ ব্যক্তি কোন স্বপ্ন দেখিতেছে কি না? অথবা কি স্বপ্ন দেখিতেছে? যেমন তাহা পার না, তেমনি সম্মুখস্থ ঐ পরলোকযাত্রীটি আপনার গন্তব্য পরলোক দেখিতে পাইতেছে কি না, অথবা কিরূপ দেখিতেছে, তাহা জানিতে, বলিতে ও বুঝিতে পার না। এই স্থানে অন্য একটি বলিবার কথা আছে। কথা এই যে, যেমন একের অন্তরস্থ সুখদুঃখ-বেদনাদি অপরে দেখিতে না পাইলেও তাৎকালিক বহিশ্চিহ্ন দেখিয়া তাহাদের অন্তরে একটা সুখ-দুঃখ-বেদনাদির সামান্য সত্তা অনুমান করা যায়, তেমনি একের পরলোক অপরে না দেখিলেও পরলোকযাত্রীর তাৎকালিক ভাবভঙ্গী দেখিয়া অর্থাৎ পরলোকগমনকালের অবস্থাবিশেষ দেখিবামাত্র এইটুকু অনুমান করিতে পারা যায় যে, এই ব্যক্তি এখন আপনার গন্তব্য পরলোক দেখিতে পাইতেছে। এতদ্ভিন্ন, ঐ উহার পরলোক, ঐ উহার স্বপ্ন, এরূপ অভিনয়সহকারে বা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির স্বপ্ন ও পরলোক দেখিবার ও দেখাইবার উপায় নাই।

বলিতে পারেন যে, স্বপ্ন যেমন প্রসিদ্ধ, পরলোক সেরূপ প্রসিদ্ধ নহে, অর্থাৎ সর্ব্বসম্মত নহে। কেন না, তুমি, আমি, তিনি—আমরা সকলেই স্বপ্ন দেখি এবং দৃষ্ট স্বপ্নের কথা বন্ধুসমাজে ব্যক্ত করি, বলাবলি করি; কিন্তু কৈ, এ পর্য্যন্ত পরলোক দেখার কথা ত' কাহার মুখে ব্যক্ত হইল না, শুনা গেল না। আস্তিক এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরদানার্থ বলেন যে, স্বপ্নদ্রষ্টা জীব এই শরীর পাতিত করিয়া স্বপ্ন সন্দর্শন করে; স্বপ্ন শেষ হইলে ইহাকে পুনরুত্থাপিত করিয়া জাগ্রত স্থিতি অবলম্বন করে; সুতরাং দৃষ্ট স্বপ্নসকল সে বন্ধুসমাজে প্রচার করিতে সমর্থ হয়। পরন্তু পরলোক-দ্রষ্টা জীব এ শরীর নিপাতিতকরতঃ আপনার গন্তব্য নিকটবর্ত্তী পরলোক দেখিতে থাকে। অবশেষে এই শরীর চিরকালের মত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, আর ইহাতে ফিরিয়া আইসে না। সেই জন্য এই শরীর পুনরুত্থিত হয় না। তাহা না হওয়াতেই পরলোকদর্শনের কথা জনসমাজে স্বপ্নের মত প্রচারপ্রাপ্ত হয় না। জীব যদি পরলোক দেখিয়া পুনর্ব্বার এ শরীরে ফিরিয়া আসিত, তাহা হইলে পরলোক দেখার কথাও স্বপ্নের মত সুপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িত। মধ্যে মধ্যে এইরূপ একটা জনবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, "অমুকের শ্বাস-প্রশ্বাসাদি রহিত হইয়াছিল, অমুক হিমাঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, মৃত্যুর সকল চিহ্ন ঘটিয়াছিল, অথচ সে বাঁচিয়া উঠিয়াছে।" "অমুককে শ্মশানস্থ করার উদ্যোগ করা হইতেছে, এমন সময়ে তাহার জীবিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইল।" এ সকল জনবাদের মূলে যদি কোনরূপ সত্য থাকে, তাহা হইলে

সেই সকল পুনর্জ্জীবিত লোকের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারাও স্বপ্নের মত নানা কথা বলিবে। আমরাও এইরূপ কথা বলিতে শুনিয়াছি, "যেন কয়েকটা বিকৃতাকার লোক আসিয়া আমাকে লইয়া গেল; যে স্থানে লইয়া গেল, সে স্থান আমি আর কখনও দেখি নাই। তত্রস্থ রাজার মত এক ব্যক্তি বলিল, 'ইহাকে আনিয়াছ কেন? তোমাদের ভুল হইয়াছে।' পরে তাহারা আমাকে রাখিয়া গেলে, আমি বাঁচিয়া উঠিলাম। ইত্যাদি।" প্রত্যেক মুমূর্ষু যদি ঐরূপে বাঁচিয়া উঠিত, তাহা হইলে পরলোকদর্শনও স্বপ্নদর্শনের মত জনসমাজে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইত। ঐরূপ ঘটনা হয় না বলিয়াই পরলোকদর্শন স্বপ্নদর্শনের মত জনসমাজে পরিচয়ের বিষয় হয় না।

বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক মনুষ্য আপন আপন পরলোক দেখিতে পায়। কিন্তু কোন্ সময়ে দেখিতে পায়, তাহা বলা হয় নাই। তাই বলা যাইতেছে যে, যেমন স্বপ্ন দেখার একটা নির্দ্দিষ্ট বা নিয়মিত সময় আছে, তেমনি পরলোক দেখারও একটা নির্দ্দিষ্ট বা নিয়মিত সময় আছে। স্বপ্ন দেখার নিয়মিতকাল নিদ্রাসমাগম, পরলোক দেখার নিয়মিত সময় মৃত্যু। মৃত্যুকাল ব্যতীত জীবের পরলোকদর্শন হয় না। এই বিষয়ে আরণ্যক শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন,—

"তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ। সান্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্। তস্মিন্ সান্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্ উভে স্থানে পশ্যতি ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।"

ইহার আক্ষরিক অর্থ এইরূপ। জীবের দুইটিমাত্র স্থান; এই একটি, আর পরলোক একটি। এই একটি কথার অর্থ, এই শরীরত্যাগের পর উৎপৎস্যমান অন্য শরীর অর্থাৎ ভাবী শরীর। যাহা ঐ উভয় স্থানের সন্ধি, তাহা সান্ধ্য ও স্বপ্নস্থান বলিয়া গণ্য; অর্থাৎ এ শরীর ত্যাগ হইয়াছে, অথচ অন্য শরীর হয় নাই, এরূপ মধ্যবর্ত্তী বা অন্তরাল অবস্থার নাম সান্ধ্যস্থান ও তাহা স্বপ্নদৃশ্য বলিয়া স্বপ্নস্থান। জীব এই সন্ধিস্থানে থাকা অবস্থায় ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই দেখিতে পায়।

শ্রুতির এই উক্তিতে বুঝা গেল যে, জীব যখন ইহলোকে থাকে, তখন সে ইহলোকই দেখে, পরলোক দেখিতে পায় না এবং যখন পরলোকে থাকে, তখন সে পরলোকই দেখে, ইহলোক দেখিতে পায় না। কিন্তু যখন সন্ধিগত হয়, তখন সে ইহলোক ও পরলোক উভয়ই দেখিতে পায়। অর্থাৎ পরিত্যক্ত ইহলোকের কিছু বা কোন কোন অংশ এবং প্রাপ্তব্য পরলোকের কিছু বা কোন অংশ দেখিতে পায়। সে দেখা স্বপ্নের মত কেবল মনের দ্বারা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নহে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তখন স্থানভ্রষ্ট ও অকর্ম্মণ্য।

কথাগুলি সঙ্গত বৈ অসঙ্গত নহে। সত্য সত্যই বিস্তীর্ণ স্থানদ্বয়ের একতর স্থানে অবস্থানকালে অন্যতর স্থান দেখা যায় না। পরন্তু সন্ধিস্থানে স্থিত হইলে, উভয় স্থানেরই কোন কোন অংশ দেখা যায়। আমরা কলিকাতায় স্থিতিকালে ভবানীপুর দেখিতে পাই না এবং ভবানীপুরে থাকার সময় কলিকাতাকে দেখিতে পাই না। কিন্তু যখন কলিকাতা ও ভবানীপুরের

সন্ধিস্থানে দাঁড়াই, তখন কলিকাতারও কিছু দেখি এবং ভবানীপুরেরও কিছু দেখি, তাহার অন্যথা হয় না। সুতরাং জীব ইহ-পরলোকের অন্তরালে থাকার অবস্থায় ইহলোক-পরলোক দেখে—এ কথা অসঙ্গত বা অসম্ভব নহে। অপিচ, আমরা যে প্রত্যহ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন নামধেয় অবস্থায় সঞ্চরণ করি, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও, উপরি-উক্ত কথার সত্যার্থতা বোধগম্য করিতে পারি। আমরা যখন জাগ্রতে থাকি, তখন স্বপ্ন দেখি না এবং যখন স্বপ্নে থাকি, জাগ্রৎ দেখি না। কিন্তু যখন পূরা জাগ্রৎ নহে ও পূরা স্বপ্ন নহে, এরূপ মধ্য অবস্থায়, আমরা জাগ্রৎ স্বপ্ন উভয়েরই কোন কোন অংশ দেখি অর্থাৎ অনুভব করি। করি কি না, তাহা অনুসন্ধান কর, অর্থাৎ মনে মনে ভাবিয়া দেখ। নিদ্রা আসিয়াছে, অথচ গাঢ় হয় নাই, এরূপ অবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তিকে যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে সে পরিষ্কার প্রত্যুত্তর দিতে পারে না। না পারিবার কারণ এই যে, তখন সে জাগ্রৎস্বপ্নের সন্ধিগত। সম্পূর্ণরূপে জাগ্রৎ পরিত্যক্ত হয় নাই এবং সম্পূর্ণরূপে স্বপ্নাবস্থাও আইসে নাই। কাজেই সে অস্পষ্ট ও প্রশ্নসঙ্গত প্রত্যুত্তর দিতে পারে না। সন্ধিস্থানগত পরলোকযাত্রীদিগের অবস্থাও ঐরূপ হইয়া থাকে। তাহারাও প্রাণপরিত্যাগকালে ঠিক একবার ত্যক্তব্য ইহলোক মনে করিয়া কাতর হয়, পরক্ষণেই আবার গন্তব্য পরলোক দেখিয়া ইহলোক ভুলিয়া যায়; ইহলোক ভুলিয়া গিয়া অস্পষ্ট পরলোকের কথা বলিতে থাকে। আমরা যাহাকে Delirium বা প্রলাপ বলি, তাহাই তাহাদের

পারলৌকিক প্রতিচ্ছায়াদর্শনের চিহ্ন। অনেক মুমূর্ষু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে অনেক অনাসন্ন কথা বলে, শোক-হর্ষ-বিষাদাদি প্রকাশ করে, কেহ কেহ দেশান্তর-গমনের কথা বলে, কেহ কেহ যমদূত-সমাগমের কথাও বলে। তাহাদের ঐ সকল উক্তি ও ঐ সকল ভাবভঙ্গী আমাদের নিকট Delirium অর্থাৎ প্রলাপ বলিয়া গণ্য হইলেও সে সকল তাহাদের নিকট অপ্রলাপ। তৎসঙ্গে কতকটা প্রলাপও থাকে বটে, পরন্তু কোন্‌গুলি প্রলাপ ও কোন্‌গুলি অপ্রলাপ, তাহা বাছাই করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে সে সম্বন্ধে আমরা মাত্র এইটুকু বলিতে পারি যে, ধাতুপ্রকোপজনিত প্রলাপ এক প্রকার ও দৃষ্ট-পারলৌকিক-প্রতিচ্ছায়া অন্য প্রকার। সেই প্রভেদ আমরা বুঝিতে পারি না বলিয়া আমরা মোটের উপরে বলি, রোগী প্রলাপ বকিতেছে।

বলা হইয়াছে যে, জীব ইহলোকের অবসান ও পরলোকের প্রারম্ভ, এতদ্রূপ সন্ধিস্থানে উপস্থিত হইয়া ইহলোকেরও কিছু ও পরলোকেরও কিছু দেখিতে থাকে। কিছু দেখা বৈ সম্পূর্ণ দেখার অধিকার কাহারও কোনও সময়ে নাই। আমরা যে জীবদ্দশায় চক্ষুর্দ্বারা বৃক্ষাদি দর্শন করি, তাহাও কিছু সম্পূর্ণ নহে। চক্ষুর্দ্বারাও আমরা বৃক্ষের সর্ব্বাংশ দেখি না; কেবল সম্মুখভাগটাই দেখি, পশ্চাদ্ভাগ ও অভ্যন্তরভাগ আমাদের অদৃশ্য থাকে। তথাপি আমরা বলিবার সময় বলি, বৃক্ষ দেখিতেছি। এইরূপ শ্রুতিও বলিয়াছেন, "সান্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্ উভে স্থানে পশ্যতি।"

আমরা বলিয়াছি, শ্রুতিও বলিয়াছেন, সন্ধিস্থানগত জীবের

পরলোকদর্শন চক্ষুরাদি-নিরপেক্ষ কেবল মানস; সুতরাং চক্ষুরাদি-নিরপেক্ষ কেবল মানস স্বপ্নদর্শনের সদৃশ পরলোক-দর্শন স্বপ্নদর্শনের সহিত তুলিত হইতে দেখিয়া কেহ যেন এমন মনে না করেন, পরলোকদর্শন স্বপ্নের মত সর্ব্বৈব মিথ্যা। স্বপ্ন যেমন সর্ব্বৈব মিথ্যা, সেইরূপ পরলোক দেখাও সর্ব্বৈব মিথ্যা। এমন লোক নাই, যিনি সমুদয় স্বপ্নকে সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। মনুষ্যমাত্রেই জানেন, বিদিত আছেন যে, স্বপ্নের মধ্যেও সত্য মিথ্যা দুই প্রকার বিভাগ আছে। স্বপ্নে মন্ত্রপ্রাপ্তি, নিধিদর্শন, ঔষধলাভ ও বন্ধুমরণ প্রভৃতি বিষয় সত্য-বিভাগের অন্তর্গত। স্বপ্ন সত্য হয় কেন? এ প্রশ্নের সপ্রমাণ সমাধান এরূপ ক্ষুদ্র পুস্তকে পর্য্যাপ্ত হইবার নহে। ফলকথা, স্বপ্ন যেমন সত্য মিথ্যা দ্বিবিধ, সেইরূপ পরলোকদ্রষ্টা মুমূর্ষুর তাৎকালিক জ্ঞানও সত্য মিথ্যা দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যেগুলি ধাতুবিকারজনিত, সেইগুলি মিথ্যা এবং যেগুলি পরলোকদর্শনমূলক, সেগুলি সত্য।

ঠিক মনে পড়িতেছে না, বোধ হয়, বাঙ্গালা ৮১ কি ৮২ সালে কলিকাতার দর্জ্জিপাড়ায় একটি অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার বাতশ্লেষ্ম-বিকার হয়। সে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যে-সকল প্রলাপ বকিয়াছিল, তন্মধ্যে একটি সংস্কৃত শ্লোক ও অনেকগুলি প্রত্যুত্তরকল্প সংস্কৃত কথা ছিল। ঐ স্থানের ডাক্তার নন্দলাল ঘোষ ঐ সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি সে সকল শুনিয়া বলিয়াছিলেন, কোনক্রমে এ সকলকে বিকারজনিত প্রলাপ বলিতে পারি না। অপর একজন পণ্ডিত লোক

তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন, এই কন্যাটি এখন আপনার ভাবী পরলোক দেখিতেছে, এখনই এ ইহলোক পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ আসন্নমৃত্যু রোগীর মুখে আরও অনেক প্রকার প্রলাপ শুনা গিয়াছে, যে সকলকে পরলোক-দর্শনের বাহ্যিচিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতএব পরলোক যখন কথিত সময়ে ও কথিত প্রকারে মানবগণ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হয়, তখন উহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রমেয় বলা অসঙ্গত নহে।

অনুমান-প্রমাণ

বলা হইল যে, পরলোক প্রত্যক্ষ, পরন্তু সে প্রত্যক্ষ অন্য সময়ে অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে। মৃত্যুসময় ব্যতীত অন্য সময়ে দেখা যায় না; দেখা না গেলেও অনুমানের বিষয় হয়। বুদ্ধিমান্ ও অনুসন্ধানী মানব ইহলোকে থাকিয়া সামান্যতঃ পরলোকসত্তা অনুমান করিতে পারেন। তাঁহারা যে-সকল চিহ্ন দেখিয়া পরলোকসত্তা অনুমান করেন, সেই সকল চিহ্নের উল্লেখ ও তৎসঙ্গে অনুমানের সংক্ষেপ প্রণালী বর্ণিত হইল। বলা বাহুল্য যে, সে সকল স্থান ও চিহ্নাদি প্রধানতঃ পূর্ব্বজন্মের অনুমাপক হইলেও তৎপরম্পরায় পরজন্মের অনুমাপক। পরজন্ম আর পরলোক একই অর্থের কথা এবং এতজ্জন্ম আর ইহলোক তুল্য কথা। সেই পূর্ব্বজন্মের পরলোক এতজ্জন্ম এবং এতজ্জন্মের পরলোক ভাবী জন্ম, এতদ্রূপ ক্রমপরম্পরায় পূর্ব্বজন্মানুমানের দ্বারা তৎপরবর্ত্তী পরলোকের অনুমান সিদ্ধ

হয়। কারণ দেখিয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যের অনুমান এবং কার্য্য দেখিয়া পূর্ব্ববৃত্ত কারণের অনুমান করা জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম থাকাতেই জীব অনায়াসে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে; অন্যান্য জীব অপেক্ষা মনুষ্যজীব এই ধর্ম্মের সমধিক উৎকর্ষ বা অতীব প্রাবল্য। তাই মানুষ আজ এত উন্নত। এই উন্নত জীবদিগের মধ্যে শত শত, সহস্র সহস্র জীব আপন স্বতঃসিদ্ধ বা স্বাভাবিক অনুমানশক্তিকে কেবলমাত্র দেহযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী কৃষি-বাণিজ্যাদি ব্যাপারে ক্ষয়িত করে না, আরও অধিক দূরে প্রয়োগ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। সেই চেষ্টার ফলে ইহারা দেখিতে পায়, একজন্মবাদ প্রাকৃতিক কার্য্য-কারণ-নিয়মের বিরুদ্ধ।

একজন্মবাদ

আগে একজন্মবাদ কি, তাহা বলা যাউক; পরে তাহা যেরূপে বিরুদ্ধ, তাহা বলা যাইবে। আগেও ছিলাম না, পরেও থাকিব না; মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ কালের জন্য এই একটা জন্ম অতিথি-অভ্যাগত-আগন্তুকের মত হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া ভাবসমর্থনার্থ যে-সকল বাক্য রচনা করা হয়, সেই সকল বাক্যের সমষ্টি একজন্মবাদ নামে প্রসিদ্ধ। কার্য্য-কারণ-পরিপাটীর অকাট্য নিয়ম ঐ একজন্মবাদের বিরোধী; অর্থাৎ প্রাকৃতিক কার্য্য-কারণ-নিয়ম ঐ একজন্মবাদ সমর্থিত হইতে দেয় না,—বাধা জন্মায় বা ভঙ্গযোগ উপস্থিত করে।

একটি নিয়ম, কারণ সংযোগে কার্য্যের অবশ্যম্ভাব। আর একটি নিয়ম, যাহা হয়, তাহা কারণশূন্য নহে। বিনা কারণে কোন কিছু হয় না। এতদনুসারে বুঝা উচিত যে, এই জন্ম আপাতবোধে অতিথি-অভ্যাগতের মত আগন্তুক বলিয়া বোধ হইলেও, বিচারদৃষ্টিতে স্থির হয়, এই জন্ম অতিথি-অভ্যাগতের মত আগন্তুক নহে অর্থাৎ বিনা কারণে হয় না। যে কারণে হইয়াছে, সে কারণ কি? স্ত্রী-শরীরের ঋতুরক্ত আর পুং-শরীরের শুক্রধাতু প্রক্রিয়াবিশেষে মিশ্রিত হইলেই যদি জন্মকারণ হয়, তাহা হইলে প্রোক্ত নিয়মানুসারে ঋতু-নৈষ্ফল্য ও অনপত্যতা প্রভৃতি ঘটনা না হওয়াই উচিত। এ কথা আমরা না বলিলেও কারণসংযোগে কার্য্যের অবশ্যম্ভাব নিয়মই বলিবে। হরিদ্রা ও চূণ মিশ্রিত করা হইল, অথচ লাল হইল না। এরূপ ঘটনা কখনও হয়ও নাই। হইবেও না। অতএব, ঋতু-নৈষ্ফল্য প্রভৃতি কারণ দেখিয়া পণ্ডিতগণ বলেন, অর্থাৎ অনুমান করেন, কেবল শুক্রশোণিতসংযোগ জন্মকারণ নহে, তৎসঙ্গে আরও কোন একটা দুর্ব্বোধ্য বস্তুর সংযোগ থাকে। যেবার সেই দুর্ব্বোধ্য বস্তুর সংযোগ থাকে, সেইবার গর্ভজন্ম হয়; যেবার থাকে না, সেবার গর্ভজন্ম হয় না। যে বস্তুর সংযোগে শুক্রশোণিত সমবেত হয় ও গর্ভাকার ধারণ করে, সেই বস্তুর নাম জীব, ইহা শেষবৎ অনুমানে স্থিরীকৃত হয়। জীবসংযোগ থাকা স্থিরীকৃত হয় বলিয়াই মনুষ্য ইহলোকবাসকালে আপন আপন পূর্ব্বজন্ম ছিল বলিয়া অনুমান করে এবং ইহাও অনুমান করে যে, যেমন পূর্ব্বজন্মের পর এতজ্জন্ম হইয়াছে, তেমনি এতজ্জন্মের পরও পুনর্ব্বার

অন্য জন্ম হইবে। সেই অন্য জন্ম আমাদের পরলোক শব্দে অভিধেয়।

কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম

কর্ম্ম ও কর্ম্মফল কার্য্যকারণনিয়মে আবদ্ধ। কায়িক, বাচিক ও মানসিক ব্যাপারের নাম কর্ম্ম, এবং সুখ, দুঃখ, মোহ, ভোগ তাহার ফল। ফল ও কার্য্য শব্দ একপর্য্যায়ভুক্ত। ভোগরূপ ফল বা কার্য্য, কর্ম্মরূপ কারণের অনুমাপক এবং কর্ম্মরূপ কারণ, ভোগরূপ ফলের বা কার্য্যে অনুমাপক। সেই জন্য নবপ্রসূত শিশুর এতজ্জন্মকৃত কর্ম্ম না থাকিলেও হর্ষ-বিষাদাদি ভোগ দেখিয়া তদীয় পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মসংস্কাররূপ কারণ থাকা অনুমান করা হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণকৃত কর্ম্মের ফল জন্মান্তভোগ্য বলিয়া স্থির করা হয়। ইহার অন্যথা পক্ষে কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম নামধেয় দোষ বা আপত্তি অনিবার্য্য। কর্ম্ম কৃত হইল, অথচ ফলের হানি হইল,—এরূপ হওয়ার নাম কৃতহানি। আর কোনও কিছু করা হইল না, অথচ হর্ষ-বিষাদাদি ভোগ আসিয়া উপস্থিত হইল,—এরূপ হওয়ার নাম অকৃতাভ্যাগম। এই কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম, অনুমান-শাস্ত্রের ও প্রাকৃতিক কার্য্যকারণ-নিয়মের বিরুদ্ধ।

এই জীবজগতে সুখ-দুঃখাদি ভোগ ও তজ্জনক কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোনও ব্যাপার নাই। কোন জীব অন্ততঃ মুহূর্ত্তেকের জন্যও নিষ্কর্ম্মা ও নিরুপভোগ নহে। এক দিক্ দিয়া দেখুন,

দেখিতে পাইবেন, আমরা অনবরত কর্ম্ম করিতেছি। আবার অন্য দিক্ দিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন, আমরা নিরন্তর সুখ, দুঃখ, মোহ ভোগ করিতেছি। কর্ম্মের ও ভোগের এইরূপ একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ যে কোন্ অনাদিকালে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা মনুষ্য-জীবের সাধ্য-বহির্ভূত। নিরন্তর অনুসন্ধানরূপ পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, কেবল ফলভোগ হওয়াই নিয়ম, কালের কোনও নিয়ম নাই। ফলাফল কখনও শীঘ্র হয়, তৎক্ষণাৎ হয়; আবার কখনও বা বিলম্বে হয়, অতি বিলম্বে হয়। কাঁচা পারা ভক্ষণের ফল, এমন কি, পুত্রশরীরেও ভোগ হইতে দেখা যায়। অতএব এতদ্দেহকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম-এতদ্দেহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ফলপ্রসব না করে ত' ভাবী দেহে গিয়া করিবে। এইরূপ এইরূপ অনেক চিন্তা ও বিচার পরলোক-অনুমানের অনুকূলে উপস্থিত করা যাইতে পারে।

ক্রিয়ার শিল্প কর্ম্ম, তাহা অনুষ্ঠান বা প্রয়োগকালে থাকে, তৎপরে থাকে না: কিন্তু সেই অনুষ্ঠান বা প্রয়োগ যে সংস্কার জন্মায়, অর্থাৎ ফলদায়িকা শক্তি জন্মায়, সে সংস্কার বা শক্তি বহুকাল থাকে, অর্থাৎ ফলোৎপত্তির কাল পর্য্যন্ত থাকে, ইহা উদাহরণদৃষ্ট ও সত্য। তাই মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত "চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা।" এই অতিশয় শব্দ সংস্কার-বিশেষের বা শক্তিবিশেষের বোধক।

একটি বিষম টোকো আমের আঁটি মধুভাণ্ডে কিংবা চিনির মধ্যে সপ্তাহকাল রাখ, তাহাতেই সেই আঁটির মধ্যস্থিত আমের

গাছ ঐ সাপ্তাহিক প্রয়োগে বা সাপ্তাহিক সহবাসে মধুর রসের সংস্কারধারী হইবে। সেই সংস্কার উপযুক্ত কালে অতি সুমধুর আম্রফলজন্মের কারণ হইবে।

'আঁটির ভিতর আমের গাছ' কথাটা আপাততঃ প্রত্যয়যোগ্য না হইলেও দার্শনিক বিচারের পর প্রত্যয়যোগ্য হয়। দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলেন, প্রত্যেক বীজের ভিতর, যে বৃক্ষের বীজ, সেই বৃক্ষ এক একটি অতি সূক্ষ্ম অব্যক্তাকারে অবস্থান করে, কালে ও ভূম্যাদিসহকারে সেই বৃক্ষই ক্রমে স্থূল ও পুনঃ ফলপ্রদানযোগ্য হয়। যেন এই তথ্য উপদেশ করিবার জন্যই প্রকৃতি দেবী অথবা সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা কোনও কোনও বীজের মধ্যে দর্শনযোগ্য বৃক্ষ সংরক্ষিত করিয়া থাকেন। একটি পরিণত পদ্মবীজ ভাঙ্গিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, তন্মধ্যে অতি ক্ষুদ্র অথচ দর্শনযোগ্য সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন একটি পদ্মগাছ রহিয়াছে। ঐরূপ পরিণত আমের আঁটির মধ্যেও অতি ক্ষুদ্র আমের গাছ বিদ্যমান থাকে। এই অষ্টিমধ্যগত বৃক্ষেই মধুর রসের সংস্কার উৎপন্ন ও অবস্থিত ছিল, আঁটিতে নহে; আঁটি উহার আবরণ মাত্র। আবরণটি পড়িয়া যায়, বৃক্ষ ক্রমে শাখাকাণ্ডাদিমান বৃহৎ পদার্থে পরিণত হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি মানবীয় কর্ম্মসংস্কারও মানবদিগের স্থূলশরীরে উৎপন্ন ও স্থিত হয় না। কর্ম্মাশয় নামক সূক্ষ্মশরীরেই উহা উৎপন্ন ও স্থিত হয় এবং তাহাই যথাকালে ভোগাদি, উৎপাদন করে। রক্তমাংসাদিময় স্থূলশরীর কর্ম্মসংস্কারের আশ্রয় বা আধার নহে। কেন? তাহা বিবেচনা কর।—

এই স্থূলশরীরের একটি নাম পুদ্গল। "পূর্য্যতে গলতি চ" একবার পূরিতেছে ও একবার গলিয়া যাইতেছে। অহরহঃ ভুক্ত দ্রব্যের দ্বারা ইহার পূরণ ও শ্রমাদি দ্বারা ক্ষয় হইতেছে, পুরাতন উপাদানের স্থানে নূতন উপাদানসকল যোজিত হইতেছে। ইংরাজ পণ্ডিতেরাও বলেন, ঐরূপ ক্ষয়পূরণ হওয়াতে প্রতি ছয় বৎসর অন্তর সম্পূর্ণ নূতন শরীর হয় বলিয়া বর্ণনা করা যায়। স্থূলশরীরের যখন তদ্রূপ অবস্থা, তখন আর তদাধারে কোনরূপ স্থায়ী সংস্কার থাকার আশা কি? সম্ভাবনা কি? কেন না, শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তদাধারস্থ সংস্কারের পরিবর্ত্তনও সুসম্ভব এবং প্রোক্ত কারণে শৈশব-সংস্কার বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত থাকাও অসম্ভব। অতএব সেই সকল সংস্কার কোথায় ও কিরূপে থাকে? কিরূপেই বা স্মৃতি জন্মায়? এইরূপ এইরূপ চিন্তার পর সিদ্ধান্ত খাঁটি করা হয় যে, কর্ম্মাশয় এক স্বতন্ত্র বস্তু; তাহা রক্ত-মাংস নহে, অস্থিও নহে এবং স্নায়ুও নহে। কর্ম্মাশয় ও সূক্ষ্মশরীর-নামধেয় অন্তঃকরণ-পদার্থেই কর্ম্ম-সংস্কার উৎপন্ন ও স্থিত হয়। এই কর্ম্মাশয় জীব-সমকালিক অর্থাৎ জীব যতকাল, কর্ম্মাশয়ও ততকাল। এতদ্রূপ স্থিরতর সিদ্ধান্তের অনুগামী হইয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, মৃত্যু শেষ নহে, মৃত্যুর পরেও জীব থাকে এবং সেই জীব কৃতকর্ম্মের ফলাফলসমূহ ভোগ করিতে থাকে।

স্বপ্ন

স্বপ্ন কি ও কেন হয়? ভাবিতে গেলে জন্মান্তর অবশ্য স্বীকার্য্য হইয়া উঠে। সকল দেশের পণ্ডিতের মত—পূর্ব্বানুভূত

বিষয় ব্যতীত অনুভূত বিষয়ের স্বপ্ন হয় না। কিন্তু সময়ে সময়ে এমন সকল স্বপ্ন দেখা যায়, যাহা ইহজন্মে কখনও কি দেখা, কি শুনা, কোন প্রকারে অনুভবের বিষয় হয় নাই। কে কবে আত্মমরণ, স্বশিরশ্ছেদ, আকাশভ্রমণ, সমুদ্রসন্তরণ ও শ্বেতদ্বীপদর্শন প্রভৃতি অনুভব করিয়াছে? তাহা করে নাই, অথচ ঐ সকল বিষয়ের স্বপ্ন হয়। যে ব্যক্তি বর্ণ বা অক্ষর কি, তাহা জানে না, কস্মিন্‌কালেও কোনও বর্ণের আকৃতি দেখে নাই, সেও স্বপ্নে হ্রীং দূং প্রভৃতি মন্ত্রাক্ষর দেখিতে পায়। ঐ সকল মন্ত্র স্বপ্নলভ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। বলা বাহুল্য যে, মনুষ্য এমন সকল স্বপ্ন দেখে, যাহা ইহজন্মে অদৃষ্ট, অশ্রুত ও সর্ব্বপ্রকারে অননুভূত। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলেন, পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কারই ঐ সকল স্বপ্ন সন্দর্শন করায়। সে পূর্ব্বানুভব ইহজন্মের নহে, কিন্তু জন্মান্তরের। ঐরূপ অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অননুভূত স্বপ্নদর্শন হয়, অথচ তাহার মূলে কোন কারণ নাই, এরূপ হইতেই পারে না। কাজেই প্রাকৃতিক কার্য্যকারণ-ভাবের নিয়মদর্শী মানবগণ ঐরূপ ঐরূপ স্বপ্নকে জন্মান্তরীয়-সংস্কারমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। ঋষিও বলিয়াছেন—

"দৃষ্টঞ্চাদৃষ্টঞ্চ অনুভূতঞ্চাননুভূতঞ্চ সর্ব্বং পশ্যতি।"

আচার্য্যও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"অদৃষ্টমিতি ইহজন্মন্যদৃষ্টং তথাচ জন্মান্তরদৃষ্টমিত্যর্থঃ।"

জন্মান্ধের ও শিশুর স্বপ্ন

সাধারণ স্বপ্নে অনেক তর্ক উঠিতে পারে; পরন্তু শিশুর ও জন্মান্ধের স্বপ্নে কোনপ্রকার তর্ক স্থানপ্রাপ্ত হয় না। সাধারণ

স্বপ্নবিষয়ে তার্কিকগণ এইরূপ তর্ক তুলিতে পারেন যে, মানুষ শির ও তাহার ছেদ দুই-ই দেখিয়াছে; স্বপ্নকাল আপনাতে তদ্দ্বয়ের আরোপ বা ভ্রম দর্শন করে। মানুষ জাগ্রৎকালের ন্যায় স্বপ্নকালেও ভ্রান্ত থাকে। যাহাই হউক, শিশুর ও জন্মান্ধের স্বপ্নে ঐরূপ বা অন্য কোনরূপ তর্ক স্থান পাইবে না। শিশু মাতৃক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া হাসে, কাঁদে ও ভয়ে কম্পমান হয়। সেই সেই ব্যাপার তাহার স্বপ্নদর্শনের চিহ্ন, শিশুর সেই সকল স্বপ্ন-চিহ্ন নারীসমাজে "ছ্যায়লা" নামে প্রসিদ্ধ। শিশুকে "ছ্যায়লা" করিতে দেখিলে শিশুর মাতা অথবা অন্য নারী ষাটষাট্ বলিয়া ষষ্ঠীদেবীর স্মরণ করে, ইহা অনেকেই জানেন। শিশু সবেমাত্র এই দুই-তিন মাস পৃথিবীতে আসিয়াছে, এখনও তাহার স্বপ্ন দেখার উপযুক্ত সংস্কারসঞ্চয় হয় নাই। অগত্যা বলিতে হয়, অনুমান করিতে হয়, শিশু জন্মান্তরীয় সংস্কার সঙ্গে আনিয়াছে। তাহাতেই সে সেই সেই প্রকারের স্বপ্ন দেখে।

জন্মান্ধও এতজ্জগতের কোনও কিছু দেখে নাই, অথচ সেও স্বপ্ন সন্দর্শন করে। জন্মান্ধ কোনরূপ স্বপ্ন দেখে কি না? যদি দেখে ত, কি ও কিরূপ দেখে? জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতুক ছিল। একদা আমি এক জন্মান্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি ঘুমাইয়া কি দেখ?' তদুত্তরে সে পরিষ্কাররূপে কিছু বলিতে পারিল না। পরে তাহার পিতা বলিল, 'একদিন এ নিদ্রাবস্থায় ডরাইয়া উঠিয়াছিল।' সে কথায় বুঝিয়াছিলাম, সে অবশ্য কোন ভয়াবহ আকৃতিমান্ পদার্থ দেখিয়াছিল, তাই সে ডরাইয়াছিল। তাই বলিতেছি, জন্মান্ধের স্বপ্নও পূর্ব্বজন্মের

অনুমাপক। কারণ এই যে, আকৃতিদর্শন জন্মান্ধের পক্ষে জন্মান্তরীয় সংস্কারমূলক ব্যতীত এতজ্জন্মের কোনরূপ জ্ঞানমূলক নহে। অতএব শিশুর ও জন্মান্ধের সেই সেই স্বপ্ন যেমন পূর্ব্বজন্মসদ্ভাব অনুমান করাইতে সমর্থ, তেমনি, জন্মবধিরের স্বপ্নও জন্মান্তর অনুমান করাইতে সমর্থ।

সদ্যঃপ্রসূত শিশুর স্তনপানচেষ্টা, মরণের প্রতি বিদ্বেষ, ভোগবৈচিত্র্য ও চেষ্টার সাফল্য নৈষ্ফল্য প্রভৃতি শত শত স্থান পূর্ব্বজন্মের অনুমাপক। অনুরাগ ও বিদ্বেষ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি —সমস্তই পূর্ব্বানুভবমূলক।

শিশুরা, শিশুরা কেন, আমরাও এতজ্জন্মে মরণদুঃখ অনুভব করি নাই, অথচ আমরা সকলেই সর্ব্বক্ষণ মরণের প্রতি বিদ্বিষ্ট। দেখা যায়, আগে ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান, তৎপরে তদর্থ চেষ্টা বা প্রবৃত্তি। পরন্তু সদ্যঃপ্রসূত শিশুর "স্তনপান আমার ইষ্ট" এ বোধ না হইতেই স্তন-পান-চেষ্টা উপস্থিত হয়। কাজেই বলিতে ও মানিতে হয়, জন্মান্তরীয় সংস্কার সেই সেই চেষ্টা উপস্থিত করাইয়া দেয়। এরূপ শত শত স্থান আছে, যে সকল স্থান পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা জন্মান্তর থাকা মান্য করিতে বাধ্য হই। জন্মান্তর মান্য করা আর পরলোক স্বীকার করা একই কথা।

যাঁহারা সামুদ্রবিদ্যায় বিশারদ, তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক মনুষ্যই আপন আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মের ও কর্ম্মফলভোগের তালিকা বা বিবরণসহ জন্মগ্রহণ করে। সে তালিকা তাহাদের পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে বিধাতা কর্ত্তৃক অথবা নিয়তি কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়।

সে তালিকা কি? সে তালিকা তাহাদের করচরণাদির রেখা প্রভৃতি। সামুদ্রবিৎ পণ্ডিতেরা ঐ তালিকা পাঠ করিয়া মনুষ্যের ভাবী শুভাশুভ ও জন্মকালাদি বর্ণন করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে মনুষ্যের আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য ও করচরণাদির রেখাদিও পূর্ব্বজন্মের অনুমাপক।

উপমান-প্রমাণ

পরলোক আছে, এই অংশ স্থির করিবার জন্য প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ বিন্যস্ত করা হইল। এক্ষণে পরলোক কিরূপ, এই অংশ বুঝিবার জন্য উপমান-প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতেছে।

মানুষ উপমান অর্থাৎ তুলনা শুনিয়া অর্থাৎ সাদৃশ্যজ্ঞানের দ্বারা অনেক জ্ঞাতব্য পদার্থ চিনিয়া লয়। "গবয় গাভীর মত" এই সাদৃশ্য উপদেশ শুনিয়া গবয় চিনিয়া লয়; গবয় একপ্রকার বন্য গরু। ঔষধব্যবসায়ীরা "মুগের মত মুগানি" এই তুলনা-বাক্য শুনিয়া মুগানি চিনিতে পারে; মুগানি একপ্রকার বনৌষধি। অতএব উপমান অর্থাৎ তুলনা বা সাদৃশ্যজ্ঞান যে পদার্থাবগতির কারণ, তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। সাদৃশ্যদর্শন পদার্থবগমের কারণ কি না অর্থাৎ প্রমাণ কি না, তাহা আজকালকার শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিতে অক্ষম নহে। ইঁহারা যখন Eather ও Mother শব্দে পিতর্ ও মাতর্ শব্দের যৎকিঞ্চিৎ উচ্চারণসাদৃশ্য দেখিয়া ভারত ও শ্বেতদ্বীপ উভয়স্থান-বাসীর একাভিজনতা স্বীকার করেন, তখন তাঁহারা অবশ্যই

বলিবেন ও স্বীকার করিবেন যে, সাদৃশ্য-দর্শনও পদার্থবগতির কারণ, অর্থাৎ অন্য একপ্রকার প্রমাণ। তাই বলিতেছি, বৈদ্যেরা যেমন "মুগানি মৃগের মত" এই সাদৃশ্যোপদেশ শুনিয়া মুগানি নামক বনৌষধি চিনিয়া লয়, সেইরূপ আমরাও জননীর ন্যায় হিতৈষিণী শ্রুতির নিকট "পরলোকের পথমাবস্থা স্বপ্নের মত" এই সাদৃশ্যোপদেশ শুনিয়া পরলোকের স্বরূপগত একটা স্থূলভাব বুঝিয়া লইতে পারি। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"সান্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্" ইহ-পরলোকের সন্ধি অর্থাৎ ইহলোকের শেষ ও পরলোকের প্রথমাবস্থা স্বপ্নের মত বলিয়া স্বপ্নস্থান। প্রভেদ এই যে, বিদ্যমান শরীরে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এই দুই অবস্থা ভোগ হয়, আর পরলোক বা পরলোকের প্রথমাবস্থা এ শরীরত্যাগের পর অনুভূত হয়। স্বপ্নের সহিত পরলোকের প্রথমাবস্থা যে অংশে সাদৃশ্য, তাহা বলা হইয়াছে।

শব্দ-প্রমাণ

পরলোকসদ্ভাবে শব্দ-প্রমাণ অর্থাৎ শাস্ত্র-প্রমাণ দেখান অনাবশ্যক, তথাপি কারণান্তরের অনুরোধে শব্দ-প্রমাণও দেখান আবশ্যক বোধ করিলাম। সে কারণান্তর কি? তাহা বলিতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার ইংরাজি-শিক্ষিতদিগের মধ্যে একটা কথা উঠিয়াছিল যে, ইংরাজ পণ্ডিতেরা নাকি বলেন, বেদরচনার সময় ঋষিদিগের মনে জন্মান্তরজ্ঞান উদিত হয় নাই। হইলে, কোন-না-কোন প্রসঙ্গে ঐ জ্ঞানের পরিচায়ক শব্দ বেদসংহিতার মধ্যে প্রবিষ্ট

হইত বা থাকিত। বেদসংহিতার কোন স্থানে জন্মান্তর-বোধক কথা নাই; সুতরাং বেদসংহিতা-রচনার অনেক পরে উপনিষদের সময় ঐ কথা উঠিয়াছিল। বেদসংহিতার অনেক স্থানেই মানুষের জন্মান্তর জ্ঞাপক কথা আছে, তৎপ্রদর্শনার্থই এই শব্দ-প্রমাণ নামক অংশ লিখিত হইল।

"অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ পুনঃ প্রাণমিহ
নো ধেহি ভোগম্।
জ্যোক্ পশ্যেম সূর্য্যমুচ্চরন্তমনুমতে মৃড়য়া নঃ স্বস্তি।
পুনর্নো অসুং পৃথিবী দদাতু পুনর্দ্যৌর্দেবঃ পুনরন্তরিক্ষম্।
পুনর্নঃ সোমস্তন্বং দদাতু পুনঃ পূষা পথ্যাং যা স্বস্তি॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১

সংক্ষেপ ব্যাখ্যা—

হে অসুনীতে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে এই সংসারে জন্মজন্মান্তর উত্তম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রদান করেন; তথা জন্মজন্মান্তরে উত্তম ভোগাদি প্রাপ্ত হই। আপনার অনুগ্রহে যেন আমরা সূর্য্যালোকাদি, প্রাণ ও বিজ্ঞানাদি প্রীতিচক্ষে দেখিতে পাই। হে অনুমতে! আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ সুখী করুন। এই পুনঃ শব্দ জন্মজন্মান্তরের বোধক। কেন না, একই জন্মে বার বার বহুবার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রাপ্তির প্রার্থনা অসম্ভব। আপনার অনুগ্রহে যেন সোমাদি ওষধি আমাদের উত্তম শরীরপ্রাপ্তির অনুকূল হয়, আপনি দয়াপূর্ব্বক আমাদের জন্মজন্মান্তরের দুঃখ নিবারণ করুন ও পথ্য অর্থাৎ হিত করুন।

"পুনর্মনঃ পুনরায়ুর্ম আগমন্ পুনঃ
প্রাণঃ পুনরাত্মা আগন্ পুনশ্চক্ষুঃ
পুনঃ শ্রোত্রন্ আগন্। বৈশ্বানরো
অদব্ধস্তনূপা অগ্নির্মা পাতু দুরিতাদবদ্যাৎ।"

যজুর্বেদ ৪।১৫

সংক্ষেপ ব্যাখ্যা—

হে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর। যখন যখন আমি জন্মগ্রহণ করিব, তখন তখনই যেন আমি শুদ্ধমনা, পূর্ণ-আয়ু, আরোগ্য, বল ও কুশলতা-যুক্ত জীব হই। হে বিরাট। সকল জন্মেই আপনি আমার শরীরের পোষণ করেন ও পাপতাপাদি বিনষ্ট করেন। (তাই প্রার্থনা) পুনর্জন্ম-সময়ে আপনি আমাকে দুঃখ হইতে মুক্ত করিবেন।

"আয়োধর্ম্মাণি প্রথমঃ সমাস
ততো বপূংষি কৃণুষে পুরূণি।
ধাস্যু র্যোনিং প্রথম আবিবেশায়ো
বাচমনুদিতাং চিকেত॥"

—অথর্ববেদ ৫।১।১

সংক্ষেপ ব্যাখ্যা—

ধার্ম্মিক লোক ইহজন্মে ধর্মাচরণ দ্বারা পরজন্মে দেবাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তম শরীর প্রাপ্ত হন। অধার্ম্মিক তাহা লাভ করিতে পারে না। ধাস্যু অর্থাৎ পূর্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলভোক্তা জীব দেহান্তে সূক্ষ্মদেহে সম্পরিষক্ত হইয়া প্রথমে বায়ুতে অবস্থান করে, পরে জল ও ওষধি প্রভৃতির সাহায্যে

অথবা ইন্দ্রিয়াদির ছিদ্রপথে আবিষ্ট হইয়া পুরুষের অথবা স্ত্রীর রেতস্থ হয়। তৎপরে গর্ভাশয়ে স্থিতি লাভ করে। যে ব্যক্তি অনুদিত বাণী অর্থাৎ সত্যভাষণাদিরূপ ধর্ম্মে অবস্থান না করে, সে পুনর্জ্জন্মে উত্তম শরীর ধারণ করিয়া বহু সুখাদি ভোগ করে না।

"গর্ভে নু সন্নন্বেষাম্ বেদমহং
দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।
গর্ভে চৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ।"

—ঋগ্বেদ ৩।২৭।১

সংক্ষেপ ব্যাখ্যা —

বামদেব ঋষি বলিয়াছেন, আমি গর্ভবাসকালেই দেবতা প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীর জন্ম বিবরণ জ্ঞাত হইয়াছি।

এতদ্ভিন্ন সমুদয় হিন্দুশাস্ত্রে জন্মান্তরবিষয়ক নানা কথা, নানা প্রসঙ্গ আছে। সে সকল সর্ব্ববিদিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। বলা বাহুল্য যে, উপনিষদ শাস্ত্র ঋগ্বেদের ঐ মন্ত্রের অনুবাদে বলিয়াছেন—

"পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি।"

বামদেব ঋষি গর্ভবাসকালে আপনার সর্ব্বাত্মকতাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আমিই এক সময়ে সূর্য্য হইয়াছিলাম এবং আমিই অন্য সময়ে মনু হইয়াছিলাম।

অপর কথা এই যে, এ দেশের ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন, গর্ভবাসকালে প্রত্যেক মনুষ্যের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারাবশেষ-জ্ঞান থাকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন সমাপ্ত হইলে ষষ্ঠাদি মাসে সে সকলের কোন কোন অংশ অভিব্যক্ত হইতে থাকে। এই সময়ে গর্ভিণী

গর্ভস্থ শিশুর সময়োচিত সঞ্চালন অনুভব করে এবং অন্য লোকও নিদ্রিতা গর্ভিণীর গর্ভে শিশুর অঙ্গসঞ্চালন দেখিতে পায়। গর্ভস্থ শিশুর তাদৃশ সঞ্চালন তাহার জ্ঞানসংযোগ থাকার অনুমাপক। জ্ঞানসংযোগ ব্যতীত কেবল মাংসপিণ্ডের সেরূপ সঞ্চালন অসম্ভব। ভূমিষ্ঠ হইলে বাহ্য বায়ুর সংস্পর্শে তাহার গর্ভবাসকালের সমুদায় জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। পরন্তু বামদেব ঋষি ভূমিষ্ঠ হইলেও তাঁহার গর্ভবাসকালের কোন জ্ঞান লুপ্ত হয় নাই। সাধারণ মানুষের পূর্ব্বজ্ঞান থাকে না, লুপ্ত হইয়া যায়, এ কথা যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির শাস্ত্রে ও তাহার ব্যাখ্যায় লেখা আছে। যথা—

"বাহ্যপবনস্পৃষ্টো নষ্টপ্রাচীনস্মৃতির্ভবতি
জাতঃ স বায়ুনা স্পৃষ্টো ন স্মরতি
পূর্ব্বং জন্ম মরণং কর্ম্ম চ শুভাশুভমিতি।"

অভিহিত চারি প্রমাণ ছাড়া আরও একপ্রকার প্রমাণ আছে, তদ্দারাও জন্মান্তর বা পরলোক থাকা সিদ্ধ হয়। তদ্‌যথা—

দৈবাৎ কোন কোন সময়ে কোন কোন মনুষ্যে অন্য একপ্রকার যথার্থ জ্ঞান আবিষ্ট হয়, তাহা কেবলমাত্র মনের নিজ ব্যাপারে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে নহে। অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে সেই জ্ঞান বিবিধ নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। যেমন যোগি-প্রত্যক্ষ, দিব্য-জ্ঞান, আর্য্য-বিজ্ঞান, প্রতিভা, দৈববাণী, স্বপ্নাদেশ, প্রত্যাদেশ, ভবিষ্যদ্বাণী ও জাতিস্মরত্ব প্রভৃতি পরলোক বুঝিবার ও বুঝাইবার অথবা দেখিবার ও দেখাইবার জন্য প্রথমোক্ত তিন

জ্ঞান সম্যক্ সমর্থ থাকিলেও এ পুস্তকে উল্লেখ বা বর্ণন করিতে ইচ্ছুক নহি। কেন না, ঐ তিন জ্ঞানের জ্ঞানী লোক এখন দুষ্প্রাপ্য, তৎকারণে ঐ তিন জ্ঞান বুঝাইবার জন্য উদাহরণ সংগ্রহ বা স্থল নির্দ্দেশ করিতে পারিব না; করিতে গেলে কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় আখ্যান বলিতে হইবে, তাহা বলিতে ইচ্ছুক নহি। অর্থাৎ কাল অনুসারে আমরা এই পুস্তকে লৌকিকতাযুক্ত শাস্ত্রীয়তা বলিতেই ইচ্ছুক, কেবল শাস্ত্রীয়তা বলিতে ইচ্ছুক নহি। চিন্তা-প্রকর্ষের পরিপাকে কাহারও কাহারও প্রতিভা নামক যথার্থ জ্ঞান জন্মে। মনে করা যায় বটে, সে জ্ঞান আকস্মিক; কিন্তু আকস্মিক নহে। তাহারও কারণ প্রভব। সে কারণ সত্ত্বোদ্রেক বা বুদ্ধি-নৈর্ম্মল্য। চিন্তাপ্রকর্ষের দ্বারা যে সত্ত্বগুণ উত্তেজিত হয়, সেই উত্তেজিত সত্ত্বগুণই তাদৃশী প্রতিভার উপাদান। প্রতিভা বুঝিবার উদাহরণ-কলম্বসের আমেরিকা, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ, তথা জেমস্‌ওয়াটের বাষ্পশক্তির শিল্প প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। চক্ষে দেখার ভুল থাকে ত' প্রতিভার ভুল থাকে না; সময়ে সময়ে কোন কোন মনুষ্যের অন্তরে নিজ জন্ম-মরণ-প্রবাহের প্রতিভা উদিত হওয়ার কথা শুনা যায়। যাহাদের মনে নিজের জন্মপরম্পরা প্রতিভাত হয়, আমরা ও শাস্ত্রলেখকেরা সেই সকল ব্যক্তিকে জাতিস্মর বলিয়া বর্ণন করি ও করেন। আমাদের দেশে এক সময়ে জাতিস্মর মহাপুরুষের ছড়াছড়ি হইয়া গিয়াছে। শুনা যায়, অন্যদেশে নাকি, পিথা-গোরাস ইয়ার্কাস ও এপোলোনিয়স্ প্রমুখ গ্রীক্ মহাপুরুষেরা জাতিস্মর ছিলেন।

সেই সকল জাতিস্মর মহাপুরুষদিগের প্রতিভাদৃষ্ট পূর্ব্বাপর জন্মবৃত্তান্ত তাঁহাদেরই লিপিভাষায় আবদ্ধ আছে ও তদ্দ্বারা আমরা আজ তাঁহাদের সেই পূর্ব্বাপরজন্মবৃত্তান্ত পরোক্ষজ্ঞানে রূঢ় করিতেছি।

দৈববাণী ও প্রতিভার প্রকারভেদ। যেন কেহ কিছু বলিল, যেন কিছু শুনিলাম, এইভাবে যে প্রতিভা জন্মে, সেই প্রতিভা এ দেশে দৈববাণী সংজ্ঞায় প্রথিত। দৈববাণী, আকাশবাণী, অশরীরিণী বাণী—এ-সকল শব্দ একপর্য্যায়ভুক্ত। যে স্থলে কোন ভবিষ্যদ্বিষয় কাহার প্রতিভারূঢ় হয়, আর সেই ব্যক্তি তাহা স্ববাক্যে প্রকাশ করে, তাহা হইলে সেই প্রতিভার বাক্যানুবাদ ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া গণ্য। এই দৈববাণী ও ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সময়ে অনেকানেক ব্যক্তিকে তাহার পূর্ব্বাপরজন্ম বুঝাইয়া দিয়াছে। বলিতে কি, দৈববাণী কিছুকাল পূর্ব্বে আমাকেই আমার এক বন্ধুর পরলোকযাত্রা বুঝাইয়া দিয়াছিল। আমি যখন কাশীধামে অধ্যয়ন করি, সেই সময়ে আমার এক পরম বন্ধু বহরমপুরে বাস করিতেন এবং তাঁহারই সাহায্যে আমার কাশীধামের ব্যয় অধিক পরিমাণে নির্ব্বাহিত হইত। একদিন প্রাতঃকালে আমি মনোনিবেশপূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিতেছি, সেই সময়ে হঠাৎ সেই বন্ধু যেন আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আমি চলিলাম, আর তোমার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ ঘটিবে না।" সেই আকৃতি দেখা ও ঐরূপ কথা শুনা নিমেষমধ্যে হইয়া গেল, আমি বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! সমস্ত-

দিন উদ্বেগে অতিবাহিত হইল, সন্ধ্যাকালে ডাকযোগে সেই বন্ধুবরের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইলাম।

স্বপ্নাদেশ ও প্রত্যাদেশ বলিলে লোকে যাহা বুঝে, তাহাও উক্ত লক্ষণ প্রতিভার রূপান্তর। স্বপ্নাবস্থার প্রতিভা স্বপ্নাদেশ এবং জাগ্রৎকালের প্রতিভা প্রত্যাদেশ। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপ স্বপ্নাদেশ ও প্রত্যাদেশ নাই; প্রত্যাদেশ-নামধেয় প্রতিভা প্রায়ই দেবতাঘটিত হইয়া উদিত হয়। অর্থাৎ যেন কোন দেবতা আসিয়া বলিতেছেন, তুমি অমুক কার্য্য কর, অমুক ফল পাইবে। পুরাণাদি শাস্ত্রে যে দেবতাসাক্ষাৎকার ও বরলাভ প্রভৃতির কথা আছে, সে সমস্তই প্রতিভার মহিমা, প্রত্যাদেশেরই উৎকর্ষ বা উৎকৃষ্ট অবস্থা। ইহা প্রায়ই চিত্রপ্রবাহের পরিপাকে জন্মিয়া থাকে। এ স্থলে একটি স্বপ্নাদেশের ও একটি প্রত্যাদেশের কথা বলি, সকলে মনোযোগ করুন।

১। আমার পরিচিত জনৈক উকীল একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, যেন এক মহাপুরুষ আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি ভাদ্র মাসে মরিবে এবং তৎপরে আমার সঙ্গে থাকিবে।" উকীলবাবু ঐ স্বপ্ন সত্য মনে করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বকর্ত্তব্য সকল শেষ করিলেন ও কবে মৃত্যু হইবে, এই চিন্তায় কাল কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পরে ভাদ্র মাস আগতে তিনি সহসা নৌকা হইতে পড়িয়া জলমগ্ন হইলেন, আর তাঁহাকে পাওয়া গেল না। "ভাদ্র মাসে মরিবে, তৎপরে আমার সঙ্গে থাকিবে", স্বপ্নাদেশের এই দুই কথার এক কথার সত্যতা প্রতিপন্ন

হইলে অপর কথার সত্যতাও তৎসঙ্গে প্রতিপন্ন হইতে পারে এবং তৎসঙ্গে স্বপ্নাদেশের পরলোকবোধকত্বাও প্রসঙ্গসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

২। আমার বাসস্থানের অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহাতে একটি নীচজাতীয়া বৃদ্ধা বাস করে। একদিন বৃদ্ধার গৃহে এক ব্রাহ্মণ অতিথিভাবে আগত হইলেন এবং বলিলেন, "আমি আপনার প্রসাদপ্রার্থী।" কারণ জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি শূলরোগের অসহ্য যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারলাভের কামনায় বাবা তারকনাথের নিকট গিয়া হত্যা দিয়াছিলাম, আমার প্রতি বাবার এইরূপ প্রত্যাদেশ হইয়াছে, 'অমুক স্থানে তোমার পূর্ব্বজন্মের মা অদ্যাপি জীবিতা আছেন, পূর্ব্বজন্মে তুমি তাঁহাকে সর্ব্বদা কটুবাক্য বলিয়া কষ্ট দিতে, সেই পাপে তোমার ইহজন্মে এই শূল রোগ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি তাঁহাকে গিয়া প্রসন্ন কর এবং তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ কর, করিলে তোমার রোগশান্তি হইবে।' মা! আমি সেইজন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনি এই পাপী পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং কিছু প্রসাদ অর্পণ করুন।" অতঃপর বৃদ্ধা অনেক চিন্তার পর অগত্যা হস্তে একটু চিনি লইয়া বলিলেন, "আমি এই চিনিটুকু হইতে কিছু ভক্ষণ করি, তুমি তদবশিষ্ট চিনি গ্রহণ কর।" ব্রাহ্মণ উক্তপ্রকার প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া যথাযথ স্থানে গমন করিলেন। পরে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, তিনি সেই প্রসাদভক্ষণের পর আর শূলবেদনায় আক্রান্ত হন নাই। বৃদ্ধার মুখেও শুনা গিয়াছে, বৃদ্ধার বয়ঃক্রম যখন ৪০ বৎসর, তখন তাহার

একমাত্র পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল; সে ছেলে যখন মরে, তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর। বৃদ্ধার বয়ঃক্রম এখন ৭০।৭২ বৎসর এবং অভ্যাগত ব্রাহ্মণের বয়স আন্দাজ ২৫ বৎসর। বৃদ্ধা ব্যক্ত করিয়াছে, তাহার সেই পুত্র সত্য সত্যই কটুভাষী ছিল।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত্যু

ইহলোকে আসিবার প্রথম কার্য্য শ্বাসগ্রহণ ও ইহলোকত্যাগ-কালের শেষ কার্য্য শ্বাস পরিত্যাগ। ফুসফুস, কণ্ঠনালী ও তৎসংসৃষ্ট পেশীসমূহ শ্বাসক্রিয়ার প্রধান যন্ত্র। ফুসফুস কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুকোষে বিনির্ম্মিত। বহির্বায়ু নাসাপথে ও মুখবিবর দিয়া কণ্ঠনালী দ্বারা ফুসফুসে প্রবিষ্ট হয়, তথায় সহজাত অধ্যাত্মবায়ু বা প্রাণ অবস্থান করে। প্রবিষ্ট বহির্বায়ুর চাপে বা উত্তেজনায় উক্ত অধ্যাত্মবায়ু বা প্রাণ উত্তেজিত হয়, হইয়া আগন্তুক বাহ্যবায়ুকে বহির্গত করিয়া দেয়। সেই প্রবিষ্ট অতিরিক্ত বায়ুটুকুই বহির্গত হইয়া যায়, তাহাতেই সহজাত অধ্যাত্মবায়ুর বা প্রাণের স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়। উক্ত প্রাণ যখন ইহলোক পরিত্যাগ করিবে, তখন সে বাহ্যবায়ুর সাহায্যে স্বস্থান ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধ বা অধঃ কোন একস্থান দিয়া বহির্গত হইবে। প্রাণের সেই বহির্গতির নাম মৃত্যু। এই মৃত্যুকে পরলোকগমনের দ্বার, সহায় ও বাহন বলিলেও বলা যায়। এই মৃত্যুর জন্য স্বাভাবিক ও আগন্তুক, দ্বিবিধ বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে। জ্বরাদি ব্যাধি ও কালকৃত জরা স্বাভাবিক বিধানের অন্তর্গত। • অস্ত্রাঘাত, সর্পদংশন, উদ্বন্ধন ও বিষভক্ষণ প্রভৃতি আগন্তুক বিধানের অন্তর্ভূত স্বাভাবিক বিধানে যে

মৃত্যু নিষ্পন্ন হয়, এই পরিচ্ছেদে সেই মৃত্যুর ক্রম বা পরিপাটী সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে।

কালপক্ক আম্রাদি ফলের বৃন্তে ফলবন্ধন-রস উপচিত হয় না। নৈসর্গিক উৎপাত ঘটিলেও ফলবন্ধন-রস বৃন্তগামী হয় না। তাহা না হওয়াতেই ফল বৃন্ত পরিত্যাগ করিয়া ভূপতিত হয়। এইরূপ কালকৃত জরার দ্বারা অথবা ব্যাধিবিশেষের দ্বারা প্রথমে এই হস্তপদাদিমান্ দেহপিণ্ডের পোষণক্রিয়া মৃদু হয়। পোষণক্রিয়ার মূল জঠরাগ্নি, তাহারই অনুগ্রহে ভুক্তান্ন-পরিপাকজনিত দেহধারক ধাতু অর্থাৎ রসরক্তাদি যথাযথরূপে উৎপন্ন ও উপচিত হয় না; এবং যাহা হয়, তাহাও দেহের যথাযথ স্থানগামী হয় না। দেহ তন্নিবন্ধন কৃশ, দুর্ব্বল ও যাতনাময় হয়। ক্রমে পতনোন্মুখ হইতে থাকে। মুমূর্ষুর সেই যাতনা, সেই পতনোন্মুখতা ও তজ্জনিত ব্যাকুলতা ও অভিভূতি দেখিয়া আমরা বলিয়া থাকি—লোকটার যমযন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে। অতঃপর প্রভুর তাদৃশ ব্যাকুলতা দেখিয়া তদীয় প্রধান বা মুখ্য অনুচর প্রাণও বহির্গমনের জন্য ব্যাকুল হইতে থাকে। ক্রমে সে যখন বুঝে, প্রভু আর এ দেহে থাকিবেন না বা থাকিতে পারিবেন না, পরিত্যাগযোগ্য হওয়ায় এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তরগ্রহণে যাইবেন, তখন সেই প্রাণও সপরিবারে তদনুগমনের জন্য চেষ্টাযুক্ত হয়। প্রাণের সেই বহির্গমনের চেষ্টাকে বা উদ্যোগকে আমরা রোগীর শ্বাস বা টান হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করি। যিনি মুমূর্ষুর শ্বাসের বা টানের ব্যাপার মনোযোগপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তিনি

দেখিতে পান ও বুঝিতে পারেন যে, সেই টানে মুমূর্ষুর আপাদমস্তক বাহ্য ও অভ্যন্তর, সমস্তই আকৃষ্ট হইতেছে। হৃদয়স্থ মুখ্য প্রাণের সেই টানে বা আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তদনুজীবী অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাণাবাস হৃদয়ে আসিয়া একযোগে মিলিত বা সম্পিণ্ডিত হয়। এই সময়ে কেবলমাত্র হৃৎপিণ্ড অল্প একটু সক্রিয় থাকে; অবশিষ্ট অঙ্গ নিষ্ক্রিয়, নিস্পন্দ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কোনপ্রকার বহির্ব্যাপার দৃষ্ট হয় না। ইহলোকের জ্ঞানও এই সময়ে অন্তর্হিত হয়। ঐহিক জ্ঞান লুপ্ত হওয়ার অব্যবধানে অন্য একপ্রকার অন্তর্ব্যাপার আরব্ধ হয়। সে অন্তর্ব্যাপার তাহার ভবিষ্যৎ পরলোকঘটিত এবং তাহা অস্মদাদি পৃথক্ জনের অপ্রত্যক্ষ। আমরা দেখি বটে, বুঝি বটে, মুমূর্ষু জ্ঞানশূন্য; পরন্তু সে তখনও জ্ঞানবান্। মুমূর্ষু তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য সত্য; কিন্তু অন্তর্জ্ঞান-বিশিষ্ট। তাহার অন্তরে যে জ্ঞান থাকে, সে জ্ঞান আমরা অনুমান দ্বারা, লোকসংবাদ দ্বারা ও শাস্ত্র-শাসনের দ্বারা বুঝিতে পারি। "লোকসংবাদ দ্বারা" এ কথার অর্থ এই যে, যেমন নিদ্রিতের স্বপ্নব্যাপার পশ্চাৎ তাহার মুখে শুনিয়া বুঝিয়া লই, তেমনি প্রত্যাগত পরলোকপথিকের প্রমুখাৎ তাহার তাৎকালিক অন্তর্ব্যাপারসমূহ শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিগ্রাহ্য করি। মধ্যে মধ্যে আমরা "অমুক মরিয়া বাঁচিয়াছে", "অমুকের জীবনচিহ্ন কিছুই ছিল না, তথাপি সে কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্জীবিত হইয়াছে,"—এইরূপ সংবাদ শুনিতে পাই। সেই সকল পুনর্জীবিতেরা আমাদের অভিহিত প্রত্যাগতপরলোক-

পথিক, অর্থাৎ তাহারা পরলোকগমনের পথে উঠিয়া পুনর্ব্বার ইহলোকে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই জন্য তাহারা প্রত্যাগত-পরলোকপথিক। এ স্থলে একটি সংবাদপত্রে লিখিত ঘটনা উল্লেখ করি; পড়িয়া দেখুন, বুঝিতে পারিবেন, আমরা কিরূপ ব্যক্তিকে প্রত্যাগতপরলোক-পথিক বলিতেছি।

মহিষাদলের রাজার গৃহচিকিৎসক ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি শিশুপুত্র জলমগ্ন হয়। অনেকক্ষণ অনুসন্ধানের পর শিশুর মৃতদেহ ভাসিতে দেখা যায়। তাহাকে জল হইতে উঠাইয়া নানাবিধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হইলেও কোনও ফল হয় নাই। তখন শিশুর জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া পুলিশে মৃত্যুসংবাদও প্রেরণ করা হয়; ইত্যবসরে জনৈক ভদ্রলোক বালকটিকে লবণরাশির মধ্যে চক্ষু, মুখ ও নাসিকা বাহিরে রাখিয়া, রক্ষা করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। এই উপায় অবলম্বিত হইলে দেখা গেল, কিয়ৎকাল পরেই বালকটি দর্শকবৃন্দের বিস্ময়োৎপাদনকরতঃ সহাস্যবদনে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জাগরিত হইল। শিশুটি জলমগ্ন হওয়ার পর প্রায় তিন ঘণ্টা পরে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে।—১৩১৩ সালের ২১শে চৈত্রের সঞ্জীবনী পত্রিকা দেখুন। এতদ্বিধ পুনর্জ্জীবিত ব্যক্তিরা জীবনলাভের পর নানা অনুভূতির কথা বলিয়া থাকে। তাহাদের সেই সকল কথাই আমাদের লোকসংবাদ শব্দের অর্থ। যাঁহারা অনুমানচর্চ্চা করেন, অনুমানশক্তি বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বীজ বা মূল সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া মরণকালের অন্তর্ব্যাপার সামান্যতঃ অনুমান করিতে সমর্থ

আছেন। যেহেতু আত্মা নিত্যজ্ঞানস্বভাব, সেই হেতু তাহার জ্ঞান সদা প্রবাহিত থাকে; সুতরাং মরণ ও তদুত্তরকালেও তাহার স্বভাবভুক্ত জ্ঞানের বিচ্ছেদ হয় না। দেখাও যায়, উষ্ণস্বভাব বহ্নির ঔষ্ণ্য, যাবৎ অগ্নি, তাবৎ অবস্থিত থাকে ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন, অলৌকিক জ্ঞানের উপদেষ্টা বেদও জীবের মরণকালের অন্তর্ব্যাপার নিম্নলিখিত প্রকারে উপদেশ করিয়াছেন।—

"তস্য হ এতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে। তেন প্রদ্যোতেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি। চক্ষুযোর্বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ। তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনুৎক্রামতি প্রাণমনুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনুৎক্রামন্তি সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেব অন্ববক্রামতি। তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ। তদ্‌যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্য আত্মানমুপ-সংহরতি। এবমেব অয়মাত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যমাক্রমমাক্রম্য আত্মানমুপসংহরতি।"

—আরণ্যক।

ইহার ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা এইরূপ—

"তত্র হৃদয়ে উপসংহৃত্য তেষু করণেষু যোঽন্তর্ব্যাপারঃ স কথ্যতে। তস্যেতি। তস্য বা এতস্য প্রকৃতস্য হৃদয়স্য হৃদয়ছিদ্রস্য অগ্রং নাড়ীমুখং নির্গমনদ্বারং প্রদ্যোততে স্বপ্নকাল ইব স্বেন ভাসা। তেন প্রদ্যোতেন হৃদয়াগ্রেণ এষ আত্মা বিজ্ঞানময়ো লিঙ্গোপাধির্নিষ্ক্রামতি। সোঽন্তরাত্মা তেন প্রদ্যোতেন হৃদয়াগ্র-প্রকাশেন নিষ্ক্রমমাণঃ কেন মার্গেণ নিষ্ক্রামতি ইত্যুচ্যতে

চক্ষুষোর্বেতি। তং বিজ্ঞানাত্মানমুৎক্রামন্তং পরলোকায় প্রস্থিতং পরলোকায় উদ্ভূতাকৃতমিত্যর্থঃ। প্রাণঃ সর্ব্বাধিকারস্থানীয়ো রাজ্ঞ ইব অনু উৎক্রামতি। তঞ্চ বাগাদয়ঃ সর্ব্বে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি। এষ আত্মা সবিজ্ঞানো ভবতি স্বপ্ন ইব বিশেষবিজ্ঞানবান্ ভবতি কর্ম্মবশাৎ ন স্বতন্ত্রঃ। স্বাতন্ত্র্যেণ সবিজ্ঞানত্বে সর্ব্বঃ কৃতকৃত্যঃ স্যাৎ নৈব তু তল্লভ্যতে। কর্ম্মণাহৃদ্ভাব্যমানেনান্তঃকরণবৃত্তি-বিশেষাশ্রিতবাসনাত্মকবিশেষবিজ্ঞানেন সর্ব্বো লোক এতস্মিন্ সময়ে সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেব চ আক্রমং গন্তব্যম্ অন্ববক্রামতি অনুগচ্ছতি। তং পরলোকায় গচ্ছন্তমাত্মানং বিদ্যাকর্ম্মণী বিদ্যা সর্ব্বপ্রকারা বিহিতা প্রতিষিদ্ধা চ অবিহিতা অপ্রতিষিদ্ধা চ তথা কর্ম্ম বিহিতং প্রতিষিদ্ধঞ্চ অবিহিতম-প্রতিষিদ্ধঞ্চ সমন্বারভেতে সম্যক্ অনুগচ্ছতঃ। পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ। পূর্ব্বানুভূতবিষয়া প্রজ্ঞা অতীতকর্ম্মফলানুভববাসনেত্যর্থঃ। সা চ বাসনা অপূর্ব্বকর্ম্মারম্ভে কর্ম্মবিপাকে চাঙ্গং ভবতি। তেন তামপ্য-ন্বারভতে। ন হি তয়া বিনা বাসনয়া কেনচিৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কর্ত্তুং ফলঞ্চোপভোক্তুং শক্যতে। ন হি অনভ্যস্তে বিষয়ে কৌশলমিন্দ্রিয়াণাং ভবতি। পূর্ব্বানুভববাসনাপ্রবৃত্তানান্তু ইন্দ্রিয়াণামিহাভ্যাসমন্তরেণ কৌশল উপপদ্যতে। দৃশ্যতে চ কেষাঞ্চিৎ কাসুচিৎ ক্রিয়াসু চিত্রকর্ম্মাদিলক্ষণাসু বিনৈব ইহাভ্যাসেন জন্মত এব কৌশলং, কাসুচিৎ অত্যন্তসৌকর্য্যযুক্তা-স্বপি অকৌশলং কেষাঞ্চিৎ। তথা বিষয়োপভোগেষু স্বভাবত এব কেষাঞ্চিৎ কৌশলাকৌশলে দৃশ্যতে। তচ্চৈতৎ সর্ব্বং পূর্ব্বপ্রজ্ঞোদ্ভবানুদ্ভবনিমিত্তম্। তেন পূর্ব্বপ্রজ্ঞয়া বিনা কর্ম্মণি

বা ফলোপভোগ বা ন কস্যচিৎ প্রবৃত্তিরূপপদ্যতে। তৎ তত্র দেহান্তরসঞ্চারে ইদং নিদর্শনম্। যথা যেন প্রকারেণ তৃণজলায়ুকা তৃণস্য অন্তমবসানং গত্বা অন্যতৃণং তৃণান্তরমাক্রম্য আত্মানমাত্মনঃ পূর্ব্বাবয়বং উপসংহরতি অন্ত্যাবয়বস্থানে এবমেবায়মাত্মা ইদং শরীরং পূর্ব্বোপাত্তং নিহত্য স্বপ্নং প্রতিপিৎসুরিব পাতয়িত্বা বিদ্যাং গময়িত্বা চেতনং কৃত্বা স্বাত্মোপসংহারেণ অন্যমাক্রমং তৃণান্তরমিব তৃণজলায়ুকা শরীরান্তরং গৃহীত্বা প্রসারিতয়া বাসনয়া আত্মানমুপসংহরতি। তত্র আত্মভাবমারভতে। যথা স্বপ্নে দেহান্তরমারভতে স্বপ্নদেহান্তরস্থ ইব শরীরারম্ভদেশে আরভ্যমাণে দেহে জঙ্গমে স্থাবরে বা। তত্র চ কর্ম্মবশাৎ করণানি লব্ধবৃত্তীনি সংহন্যন্তে বাহ্যঞ্চ কুশমৃত্তিকাদিস্থানীয়ং শরীরমারভ্যতে। ইতি দেহান্তরারম্ভবিধিঃ।"

উদ্ধৃত শ্রুতির ভাষ্যানুযায়ী সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ এইরূপ—

ইন্দ্রিয়গণ স্থানভ্রষ্ট ও কার্য্যভ্রষ্ট হইয়া হৃৎপ্রদেশে আসিলে, সমুদায় বাহ্যজ্ঞান ও বাহ্যব্যাপার তিরোহিত হয়।

অতঃপর যে অন্তর্ব্যাপার হইতে থাকে, শ্রুতি সেই অন্তর্ব্যাপার উপদেশ করিতেছেন। ইন্দ্রিয়সকল প্রাণাবাস হৃদয়ে আসিলে, হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রদ্যোতিত হয়। হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রদ্যোতিত হয় এ কথার অর্থ – প্রাণ যে নাড়ীমুখ দিয়া নির্গত হইবে অথবা যাহা প্রাণনির্গমের দ্বার হইবে, তাহা সেই বিজ্ঞানময় আত্মার জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত অর্থাৎ প্রকাশপ্রাপ্ত হয়। আমরা যেমন দীপালোকে উদ্ভাসিত পথে গমন করি, সেইরূপ বিজ্ঞানময় আত্মাও স্বপ্রসারিত জ্ঞানের আলোকে প্রকাশিত পথে নিষ্ক্রান্ত

হন। চক্ষু, কর্ণ, নাসা, মূর্দ্ধা (যাহার নাম ব্রহ্মরন্ধ্র) অথবা অন্য কোন স্থানস্থ ছিদ্রপথে নির্গত হন। নির্গমকালে তদীয় নিত্যসহচর ইন্দ্রিয়সকল তদনুগামী হয়। তিনি যখন এ শরীর ত্যাগ করেন, এ সকল দৃশ্য দেখেন না, তখনও তিনি সবিজ্ঞান থাকেন, অর্থাৎ তাঁহার শরীর, আকৃতি, দ্রষ্টব্য, সমস্তই একপ্রকার বিশিষ্ট জ্ঞানের বিষয় হয়। সেই জ্ঞানে তাঁহার স্বাধীনতা থাকে না। কেন না, সে সমস্তই তদীয় পূর্ব্বকর্ম্মের বশে আবির্ভূত হয়। যেমন স্বাপ্নজ্ঞান স্বাধীন নহে, পূর্ব্বসংস্কারবশে জন্মে, সেইরূপ পরলোকগমনকালের জ্ঞানও স্বাধীন নহে। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছানির্ম্মিত নহে। পূর্ব্বজন্মোপার্জ্জিত জ্ঞানকর্ম্মসংস্কার বলপূর্ব্বক সেই জ্ঞান আবির্ভূত করায়।

বিজ্ঞানাত্মা বা কর্ম্মাত্মা পূর্ব্বদেহে থাকিয়া যে-সকল বিহিত, নিষিদ্ধ ও তদুভয়বর্জ্জিত কর্ম্ম, জ্ঞান ও বিষয় ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকলের সংস্কার পরলোকপথের পাথেয়স্বরূপ এবং পরলোকপ্রাপ্তির পরেও সে লোকের উপযুক্ত কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভোগবিষয়ক কৌশল উৎপাদনের উপায় বা বীজ হইয়া রহিল। আমরা যে কোন কোন লোককে বিনা ইহজন্মের অভ্যাসে শিল্পী হইতে দেখি, আবার অতি সুকর কার্য্যেও কোন কোন লোককে অক্ষম হইতে দেখি, তাহার কারণ, পূর্ব্বসংস্কার ও পূর্ব্বসংস্কার-অভাব; এই দুই কারণ ব্যতীত, অন্য কোন কারণ উপলব্ধ হয় না। সেই জন্যই শাস্ত্রের উক্তি "পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধনম্। জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ॥" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, জীবের এই দেহান্তরসঞ্চারের কালে

তৃণজলৌকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শ্রুতি আমাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তৃণজলায়ুকারা (তৃণজলায়ুকা - চিনে জোঁক) প্রাগ্‌গৃহীত তৃণের অবসানে গিয়া, তৃণান্তর গ্রহণের চেষ্টা করে। তৃণান্তরপ্রাপ্তে আপনার অন্ত্যাবয়বস্থানে পূর্ব্বাবয়বের উপসংহার করে। এইরূপ আত্মাও প্রাগ্‌গৃহীত দেহের চরমাবস্থায় বাসনাপ্রসার দ্বারা কল্পিত অর্থাৎ ভাবনাময় শরীরান্তর গ্রহণ-করতঃ প্রাগ্‌গৃহীত শরীর পরিত্যাগ করে।

তৃণজলায়ুকারা তৃণান্তরের অপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত আশ্রয় তৃণে পূর্ব্বাবয়ব অর্থাৎ শরীরের নিম্নাংশ সংযুক্ত রাখে এবং তৃণান্তর পাইবামাত্র সে সংযোগ উঠাইয়া লয়, অর্থাৎ সেই সংযুক্ত শরীরাংশ গুটাইয়া লয়। এইরূপ আত্মাও বাসনা-শরীর নিষ্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাগ্‌গৃহীত শরীরে থাকেন, বা অভিমান রক্ষা করেন; পরন্তু বাসনা-শরীর অর্থাৎ স্বাপ্ন-শরীরের ন্যায় ভাবময় শরীর সৃষ্ট বা নিষ্পন্ন হইবামাত্র সেই অভিনব শরীরে অহমভিমান স্থাপন করেন। কাজেই সেই আত্মশূন্য দেহ তখন শবীভূত হয়। ইহারই নাম মৃত্যু। অতএব এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা গেল যে, শরীরটাই মরে, শবীভূত হয়; আত্মা মরেন না, শবও হন না, কেবল নিষ্ক্রান্ত হন, অর্থাৎ সে দেহ হইতে অহংমমাভিমান উঠাইয়া লইয়া চিন্তার দ্বারা অন্য এক অভিনব শরীর রচনা-করতঃ তদুপরি অহংমমাভিমান স্থাপন করেন; করিয়া পরিত্যক্ত শরীরের বহির্বর্ত্তী বাহ্যাকাশে গিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। শ্রুতিও আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন, উপদেশ দিয়াছেন, "জীবোপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে" ইত্যাদি

বাহ্যলক্ষণ দেখিয়া পার্শ্বস্থ আমরা ও চিকিৎসক বলি ও বলেন, মুমূর্ষুর জ্ঞান নাই, জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। এই জ্ঞান শব্দের অর্থ বাহ্যজ্ঞান, অন্তর্বিজ্ঞান নহে। বাহিরে ইহলোকোচিত জ্ঞানের কোনরূপ চিহ্ন দেখা যায় না বলিয়াই আমরা ঐ কথা বলি; পরন্তু তদ্দারা পারলৌকিক অন্তর্বিজ্ঞান নাই বলা হয় না। সে সময়ের অন্তর্বিজ্ঞান পারলৌকিক, ইহলোকের সহিত তাহার সম্পর্ক থাকে না। সে জন্য তাহার লক্ষণও ইহশরীরে প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না। কাজেই সে জ্ঞান আমাদের লৌকিক দৃষ্টির অগোচর কার্য্য করিতে থাকে। জীব যদি সামান্যতঃ জ্ঞানসংস্রবশূন্য হইত, কোনপ্রকার জ্ঞানসংস্রব না থাকিত অর্থাৎ জ্ঞানত্ব পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যাইত, তাহা হইলে প্রাগুক্ত প্রত্যাগতপরলোকপথিকের শরীরে পুনর্জ্ঞান দুষ্কর বা দুর্লভ হইত। আর একটি কথা বলিয়া এই মৃত্যুপ্রস্তাব শেষ করি।

জগতের অন্তরালে এমন অনেক পদার্থ আছে, যে-সকল পদার্থ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম। সে সকল যখন স্থূলপদার্থে আবিষ্ট থাকে, তখনই আমরা সে সকলের সত্তা উপলব্ধি-গোচর করি এবং সে উপলব্ধি সেই সেই স্থূলপদার্থের শক্তি, স্বভাব ও ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবহার করি। অন্য সময়ে সে সকল আমাদের উপলব্ধির অতীত পথে অবস্থান করে। প্রকাশ, আলোক ও ঔষ্ণ্য স্থূল বহ্নিতে আবিষ্ট; সেই জন্য আমরা বলি ও বুঝি, ঔষ্ণ্য ও প্রকাশ বহ্নির শক্তি। বহ্নির ধ্বংসে ঔষ্ণ্য ও প্রকাশ যাহাকে উষ্ণ ও প্রকাশিত করিবে, তাহার অভাবে ঔষ্ণ্যের ও প্রকাশের

স্বরূপ অননুভবনীয়। প্রকাশ্য বস্তুই প্রকাশ পদার্থের অস্তিত্বের সাক্ষ্যদাতা। আমাদের এই স্থূলশরীরে যে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তিন অন্তরিন্দ্রিয় আবিষ্ট আছে, ইহারা ঐ শ্রেণীর পদার্থ অর্থাৎ সূক্ষ্মশক্তি স্থানীয় পদার্থ; যাবৎ উহারা এই স্থূলশরীরে আবিষ্ট, তাবৎ উহারা ইহার শক্তি। স্নায়ুশক্তি বলুন, মাজ্জেয়মস্তিষ্ক-ধর্ম্ম বলুন, অথবা অন্য কোন শরীরাবয়বের শক্তি বলুন, যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন; পরন্তু যখন ঐ সকল পদার্থের আবেশ ভঙ্গ হইয়া যায়, শরীরপরিত্যাগী হয়, তখন উহা যে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম। সেই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম পদার্থের ব্যূহভাবকেই লোক ও শাস্ত্র সূক্ষ্মশরীর বলিয়া বর্ণন করেন। সূক্ষ্মশরীর, লিঙ্গদেহ, কর্ম্মাশয় এ সমস্ত একপর্য্যায়। এই সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীরের বাধ্য ও বশ্য নহে এবং স্থূলশরীরাবিষ্ট ইন্দ্রিয়পদার্থের গোচরও নহে। কাজেই স্থূলশরীরগত ও স্থূলত্বপ্রাপ্ত চক্ষু ইহার দর্শনে অনধিকারী। অনধিকারী বলিয়াই মৃতব্যক্তির সূক্ষ্মশরীর যখন বহিরাগত হয়, পার্শ্বস্থ স্থূলশরীরী মানব তাহা দেখিতে পায় না। শত অণুবীক্ষণ লইয়া বসিয়া থাক, কিছুতেই তাহা নয়নরশ্মির গোচর হইবে না। ইহাই আমাদের দেশের অলৌকিকজ্ঞানী যোগি-ঋষিদিগের সিদ্ধান্ত। পরন্তু আজকাল শুনিতেছি, মৃত্যুকালে অন্ধকার ঘরের মধ্যে ফটোগ্রাফের যন্ত্র লইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলে না কি স্থূলশরীর হইতে বহিরাগত জীবের। (প্রেতাত্মার) ফটো লওয়া যায়।

জন্মমরণের অন্তরাল

মরণের পর পুনর্জ্জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী অবস্থার নাম অন্তরাল। এই অন্তরাল উপলক্ষে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, সূক্ষ্মশরীরমাত্রাবলম্বী জীব কোথায় থাকিয়া অন্তরাল অবস্থা ভোগ করে এবং সেই অবস্থা কত দিন থাকে? প্রথম প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, যেমন পুষ্পচ্যুত গন্ধ প্রথমে বায়ুতে, তৎপরে বায়ু কর্ত্তৃক যে স্থানে নীত হয়, সেই স্থানে স্থিতিলাভ করে, সেইরূপ স্থূলদেহবিনিষ্ক্রান্ত জীব প্রথমে বহিরাকাশস্থ বায়ুতে, তৎপরে বাসনাবায়ু কর্ত্তৃক যে স্থানে নীত হয়, সেই স্থানে স্থিতিলাভ করে। এ প্রত্যুত্তর যথাযোগ্য বিবেকমূলক এবং শাস্ত্রমূলকও বটে। তদ্ভিন্ন অনুসন্ধানতৎপর হইলে তথ্যের অনুমাপক লৌকিক উদাহরণও পাওয়া যায়। একটা সংক্ষিপ্ত উদাহরণ উল্লেখ করি, পাঠকগণ অনেক বুঝিয়া দেখিবেন, অভিহিত অবস্থার অনুমিতি হয় কি না।

উদাহরণটি সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাত না হইলেও যোগীদিগের মধ্যে অতীব প্রসিদ্ধ। যোগীদিগের "পরকায়প্রবেশন" নামধেয় সিদ্ধির ফলাফল বিবেচনা করিলে বেশ বুঝা যায়, স্থূলশরীর-ত্যাগের পর সূক্ষ্মশরীরী জীব আকাশেই অবস্থিতি করে। কোন যোগী যখন পরশরীরে প্রবেশের জন্য স্বকীয় স্থূলশরীর পরিত্যাগ করেন, অথচ পরশরীরে প্রবিষ্ট হন না, সেই অন্তরালাবস্থায় তাঁহার অবস্থিতিস্থান আকাশ, অন্য কিছু নহে।

এই "পরকায়প্রবেশন"-সিদ্ধির দৃষ্টান্তে পরলোকযাত্রীর অন্তরালস্থিতি বোধগম্য হইতে পারে। বর্ত্তমানকালের থিয়োসফিষ্ট সমাজের বিশ্বাস এই যে, মানুষ স্থূলশরীর পাতিত রাখিয়া সূক্ষ্মশরীরে অবস্থানাদি করিতে পারে, সে সময়ে অবলম্বন বহিরাকাশ ও বাহ্যবায়ু।

মৃতবৎসা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে প্রথম মৃতের পুনরাগমনের কথা প্রচলিত আছে, তাহাও অন্তরালস্থিতি বুঝিবার দৃষ্টান্ত হইতে পারে। মৃতবৎসা স্ত্রীলোকেরা বিশ্বাস করে, তাহাদের পুনর্গর্ভে সেই পূর্ব্বমৃত জীব আবিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বমৃত শিশুর সেই মরণ ও কিছুকাল পরে তাহার পুনর্গর্ভপ্রবেশ এতদ্দ্বয়ের অন্তরাল আর মরণের পর পুনর্জ্জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত কাল একই প্রকার।

দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, অন্তরালাবস্থার স্থায়িত্ব পক্ষে কালের সংখ্যার স্থিরতা নাই এবং তাহা থাকাও সম্ভবপর নহে। আমাদের দেশের মহামান্য প্রাচীন ঋষি ব্যাস স্বপ্রণীত উত্তর-মীমাংসার একটি সূত্রে মাত্র এইটুকু কথা বলিয়াছেন যে, "নাতিচিরেণ বিশেষাৎ" অর্থাৎ অন্তরালাবস্থা কাটাইয়া পুনর্জ্জন্মলাভ করিতে খুব অধিক বিলম্ব হয় না। বশিষ্ঠ ঋষি এতদপেক্ষা কিছু বিশেষ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যেমন ব্যক্তিবর্গের জীবিতকাল বিভিন্ন, তেমনি তাহাদের অন্তরালও বিভিন্ন। অন্তরাল অর্থাৎ অন্তরালভোগ। সাধারণের বিশ্বাস আনয়নার্থ বশিষ্ঠ ঋষির এই বচনগুলি উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে আমারও অন্তরাল বুঝাইবার জন্য পরিশ্রমের লাঘব হইল।

"নাড়ীপ্রবাহে বিধুরে যদা বাতবিসংস্থিতিম্ ।
জন্তুঃ প্রাপ্নোতি হি তদা শাম্যতীবাঽস্য চেতনা ॥ ১
শুদ্ধং হি চেতনং নিত্যং নোদেতি ন চ শাম্যতি ।
স্থাবরে জঙ্গমে ব্যোম্নি শৈলেঽগ্নৌ পবনে স্থিতম্॥ ২
কেবলং বাতসংরোধাৎ যদা স্পন্দঃ প্রশাম্যতি ।
মৃত ইত্যুচ্যতে দেহস্তদাঽসৌ জড়নামকঃ ॥ ৩
তস্মিন্ দেহে বশীভূতে বাতে চানিলতাং গতে ।
চেতনং বাসনাযুক্তং স্বাত্মতত্ত্বেঽবতিষ্ঠতে ॥ ৪
ততোঽসৌ প্রেতশব্দেন প্রোচ্যতে ব্যবহারিভিঃ ।
চেতনং বাসনামিশ্রং আমোদানিলবৎ স্থিতম্ ॥ ৫
ইদং দৃশ্যং পরিত্যজ্য যদাস্তে দর্শনান্তরে ।
স স্বপ্ন ইব সংকল্প ইব নানাকৃতিস্তদা ॥ ৬
তস্মিন্নেব প্রদেশেঽন্তঃ পূর্ব্ববৎ স্মৃতিমান্ ভবেৎ ।
তদৈব মৃতিমূর্চ্ছান্তে পশ্যত্যন্যশরীরকম্ ॥ ৭
ভবন্তি ষড়্‌বিধাঃ প্রেতাস্তেষাং ভেদমিমং শৃণু ।
সামান্যপাপিনো মধ্যপাপিনঃ স্থূলপাপিনঃ ॥ ৮
সামান্যধর্ম্মা মধ্যধর্ম্মা চ তথা চোত্তমধর্ম্মবান্ ।
এতেষাং কস্যচিদ্ভেদো দ্বৌ ত্রয়োঽপ্যথ কস্যচিৎ ॥ ৭
কশ্চিন্মহাপাতকবান বৎসরং মৃতিমূর্চ্ছনম্ ।
বিমূঢ়োঽনুভবত্যন্তঃ পাষাণহৃদয়োপমঃ ॥ ১০
ততঃ কালেন সংবুদ্ধো বাসনাজঠরোদিতম্ ।
অনুভূয় চিরং কালং নারকং দুঃখমক্ষয়ম্ ॥ ১১

ভুক্ত্বা যোনিশতান্যচ্চৈর্দুঃখাদ্দুঃখান্তরং গতঃ।
কদাচিচ্ছমমায়াতি সংসারস্বপ্নসম্ভ্রমে॥ ১২
কোচিচ্চ মৃতিমোহান্তে জড়দুঃখশতাকুলাম্।
ক্ষণাৎ বৃক্ষাদিতামেব হৃৎস্থামনুভবন্তি তে॥ ১৩
স্ববাসানুরূপাণি দুঃখানি নরকে পুনঃ।
অনুভূয়াথ যোনিষু জায়ন্তে ভূতলে চিরাৎ॥ ১৪
অথ মধ্যমপাপো যো মৃতিমোহাদনন্তরম্।
স শিলাজঠরং জাড্যং কঞ্চিৎ কালং প্রপশ্যতি॥ ১৫
ততঃ প্রবুদ্ধঃ কালেন কেনচিদ্বা তদৈব বা।
তির্য্যগাদিক্রমৈর্ভুক্ত্বা যোনীঃ সংসারমেত্যতি॥ ১৬
মৃত এবানুভবতি কশ্চিৎ সামান্যপাতকী।
স্ববাসনানুসারেণ দেহং সম্পন্নমক্ষতম্॥ ১৭
স স্বপ্ন ইব সংকল্প ইব চেততি তাদৃশম্।
তস্মিন্নেব ক্ষণে তস্য স্মৃতিরিত্থমুদেতি চ॥ ১৮
যে তূত্তমমহাপুণ্যা মৃতিমোহাদনন্তরম্।
স্বর্গবিদ্যাধরপুরং স্মৃত্যা হ্যনুভবন্তি তে॥ ১৯
ততোঽন্যকর্ম্মসদৃশং ভুক্ত্বাঽন্যত্র ফলং নিজম্।
জায়ন্তে মানুষে লোকে সশ্রীকে সজ্জনাস্পদে॥ ২০
যে চ মধ্যমধর্ম্মাণো মৃতিমোহাদনন্তরম্।
তে ব্যোমবায়ুবলিতাঃ প্রয়ান্ত্যোষধিপল্লবম্॥ ২১
তত্র চারু ফলং ভুক্ত্বা প্রবিশ্য হৃদয়ং নৃণাম্।
রেতসামধিতিষ্ঠন্তে গর্ভে জাতিক্রমোচিতে॥ ২২
স্ববাসনানুসারেণ প্রেতা এতাং ব্যবস্থিতিম্।

মূর্চ্ছান্তেঽনুভবন্ত্যন্তঃ ক্রমেণৈবাঽক্রমেণ চ ॥ ২৩
আদৌ মৃতা বয়মিতি বুধ্যন্তে তদনুক্রমাৎ।
বন্ধুপিণ্ডাদিদানেন প্রোৎপন্না ইতিবেদিনঃ ॥ ২৪
ততো যমভটা এতে কালপাশান্বিতা ইতি।
নীয়মানঃ প্রয়াম্যেভিঃ ক্রমাৎ যমপুরং প্রতি ॥ ২৫
উদ্যানানি বিমানানি শোভনানি পুনঃ পুনঃ।
স্বকর্ম্মভিরুপাত্তানি দিব্যানীত্যেব পুণ্যবান্ ॥ ২৬
হিমানীকণ্টকশ্বভ্র-শস্ত্রপত্রবনানি চ।
স্বকর্মদুষ্কৃতোত্থানি সম্প্রাপ্তানীতি পাপবান্॥ ২৭
ইয়ং মে সৌম্যসম্পাতা সরণিঃ শীতশাদ্বলা।
স্নিগ্ধচ্ছায়া সবাপীকা পুরঃসংস্থেতি মধ্যমঃ ॥ ২৮
অয়ং প্রাপ্তো যমপুরমহমেষ স ভূতপঃ।
অয়ং কর্ম্মবিচারোঽত্র কৃত ইত্যনুভূতিমান্ ॥ ২৯
ইতি প্রত্যেকমভ্যেতি পৃথুঃ সংসারখণ্ডকঃ।
যথা সংস্থিতনিঃশেষ-পদার্থাচারভাস্বরঃ ॥ ৩০
ইতোঽয়মহমাদিষ্টঃ স্বকর্মফলভোজনে।
গচ্ছাম্যাশু শুভং স্বর্গমিতো নরকমেব বা ॥ ৩১
আঃ স্বর্গোঽয়ং ময়া ভুক্তো ভুক্তোঽয়ং নরকোঽথবা।
ইমাস্তা যোনয়ো ভুক্তা জায়েয়ং সংসৃতৌ পুনঃ ॥ ৩২
অয়ং শালিরহং জাতঃ ক্রমাৎ ফলমহং স্থিতঃ।
ইত্যুদর্কপ্রবোধেন বুধ্যমানো ভবিষ্যতি ॥ ৩৩
সংসুপ্তকরণস্ত্বেবং বীজতাং যাত্যসৌ নরে।
তদ্বীজং যোনিগলিতং গর্ভো ভবতি মাতরি ॥ ৩৪

স গর্ভো জায়তে লোকে পূর্ব্বকর্ম্মানুসারতঃ
ভব্যো ভবত্যভব্যো বা বালকো ললিতাকৃতিঃ ॥ ৩৫
ততোঽনুভবতীন্দ্বাভং যৌবনং মদনোন্মুখম্ ।
ততো জরাং পদ্মমুখে হিমাশনিমিব চ্যুতম্ ॥ ৩৬
ততোঽপি ব্যাধিমরণং পুনর্মরণমূর্চ্ছনাম্ ।
পুনঃ স্বপ্নবদায়াতং পিণ্ডৈর্দ্দেহপরিগ্রহম্ ॥ ৩৭
যাম্যং যাতি পুনর্লোকং পুনরেব ক্রমাক্রমম্ ।
ভূয়ো ভূয়োঽনুভবতি নানাযোন্যন্তরোদরে ॥ ৩৮

—বা, উ প্র, ৫৫ সর্গ ।

যাঁহারা সংস্কৃত বুঝেন না, তাঁহাদের জন্য উদ্ধৃত বচনগুলির একটি সংক্ষিপ্ত অনুভাষা প্রদত্ত হইল।

শরীরস্থ নাড়ী উচ্ছৃঙ্খল হইলে শরীরবায়ুর বিসংস্থিতি অর্থাৎ বিরুদ্ধস্থিতি ঘটে। বায়ুর স্বভাব চলন, তদ্বিরুদ্ধা স্থিতি চলনাভাব। বায়ু যখন শরীরের কুত্রাপি সঞ্চরণ না করে, জীব তখন অচেতনপ্রায় হয়।

শরীরটাই নিশ্চেতন হয়, আত্মা নিশ্চেতন হন না। জীবিতাবস্থায় অন্তঃকরণ থাকে, সর্ব্বব্যাপী আত্মা তাহাতে প্রতিবিম্বরূপে স্থিতি করেন। এক্ষণে অন্তঃকরণের উপশমে যেন আত্মারও উপশম হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হয়। আত্মার যে অন্তঃকরণশূন্য অবস্থা, সে অবস্থা বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য। তাদৃশ বিশুদ্ধ আত্মা নিত্য সর্ব্বব্যাপী। তাই বলা হয়, শাস্ত্রে বর্ণিত হয়, যে আত্মা জঙ্গমে, সেই আত্মাই স্থাবরে, ব্যোমে, জলে, অগ্নিতে, শৈলে ও পবন প্রভৃতিতে আছেন।

বায়ুর সম্যক্ পরিত্যাগে দেহের স্পন্দন নষ্ট হইয়া যায়, তাই লোকে বলে, অমুক মৃত হইয়াছে। দেহ শবত্বপ্রাপ্ত ও প্রাণ মহাবায়ুগত হইলে, চিৎ ধাতু তখন, অর্থাৎ আত্মা বা জীব তখন কেবলমাত্র বাসনামিশ্রিত অবস্থা প্রাপ্ত হন। ব্যবহারিক লোক ও শাস্ত্র উভয়েই ঐ বাসনামিশ্রিত চেতনকে প্রেত শব্দে উল্লেখ করেন।

বাসনাবলিত জীব যখন এই সকল দৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বপ্ন ও সঙ্কল্পতুল্য দৃশ্য দেখিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার সে দেখা পূর্ব্বদৃষ্টেরই অনুরূপ।

মরণমূর্চ্ছা অপগত হইলে জীব আপনাকে অন্যশরীরী দেখে। যেমন স্বপ্নকালে ও গাঢ় মনোরাজ্যকালে দেখে, তেমনি মরণমূর্চ্ছার পরেও দেখে।

প্রেত ছয় প্রকার। প্রত্যেক প্রকারের আবার দুই-তিন প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়। সামান্যপাপী (১), মধ্যমপাপী (২), স্থূলপাপী (৩), সামান্যধার্ম্মিক (৪), মধ্যমধার্ম্মিক (৫) ও উত্তমধার্ম্মিক (৬)।

কোন কোন পাপী এক বৎসর পর্য্যন্ত মরণমূর্চ্ছায় বিমূঢ় ও পাষাণের ন্যায় অন্তঃস্মৃতিশূন্য থাকে, তৎপরে বাসনা-বেষ্টনের মধ্যে সংবুদ্ধ হয়। তথা দীর্ঘকাল নরকদুঃখ অনুভব ও শত শত যোনিজন্ম ভোগ করিতে থাকে। এই জীব দৈবাৎ কদাচিৎ সংসারস্বপ্ন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেও করিতে পারে।

কোন কোন পাপী মৃতি-মোহের পর আপনাকে জড়বৃক্ষাদিভাব

দেখে এবং বাসনানুরূপ শত শত দুঃখভোগকরতঃ দীর্ঘকাল যোনিজন্ম অনুভব করিতে থাকে।

কোন কোন মধ্যমপাপী মৃতি-মোহের পর, অতি অল্পকালের জন্য আপনাকে জড়স্বভাবাপন্ন দেখে, তৎপরে প্রবুদ্ধ হয়। কোন কোন পাপী মৃতি-মোহের অব্যবহিত পরেই বাসনোচিত বোধ প্রাপ্ত হয় এবং কেহ বা তির্য্যগ্‌যোনিতে গিয়া উৎপন্ন হয়।

কোন কোন সামান্য পাতকী মরণের পরেই আপনাকে বাসনানুরূপ দেহ প্রাপ্ত হইতে দেখে। যেমন স্বপ্ন, যেমন গাঢ় মনোরাজ্য, সেইরূপ।

যাহারা উত্তম পুণ্যবান্‌, তাহারা মরণমূর্চ্ছার পরেই স্বর্গপুরী ও বিদ্যাধরাদির পুরী অনুভবদ্বারা ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে থাকে। তৎপরে পুনর্ব্বার এই মানুষ্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে।

যাহারা মধ্যমপুণ্যবান্‌, তাহারা মরণমূর্চ্ছার পর আকাশ ও বায়ু উভয়ের সাহায্যে নন্দনকাননাদি স্থান, যক্ষকিন্নরাদি শরীর ও তদুপযুক্ত সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। ভোগসমাপ্তে পুনর্ব্বার বৃষ্টিজলাদি-বাহিত হইয়া শস্যাদি-শরীরে আবিষ্ট হয়, ক্রমে পুংরেতঃ দ্বারা স্ত্রীগর্ভে গিয়া শরীরোৎপত্তি অনুভব করে। নিয়তির নিয়মে ও কালক্রমে, প্রেতসকল আপন আপন বাসনার অনুসারে মৃতি-মোহভঙ্গের পর অভিহিত বা বর্ণিত ব্যবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হয়।

জীব মৃতি-মোহভঙ্গের পরেই প্রথমে ভাবে, আমি মরিয়াছি। তৎপরে ভাবে বা অনুভব করে, পুত্রাদিকৃত পিণ্ডদানাদির দ্বারা

আমার শরীর সম্পন্ন হইল। পরে দেখে, যমদূত আসিয়া তাহাকে যমলোকে লইয়া গেল। যমপুরে যাইবার সময় পুণ্যবান্ লোকেরা ভাবে, তাহার সুখসেব্য উদ্যানাদি ও বিমানাদি পাইয়াছে এবং পাপী লোকেরা অনুভব করে, তাহারা যেন পথে হিমসংঘাত, কণ্টক, গর্ত্ত ও অস্ত্রশস্ত্রাচিত বন দ্বারা বিবিধ কষ্ট বা বিবিধ যাতনা পাইতেছে। ক্রমে তাহার ভাবময় জ্ঞানে জানে, যমপুরে আসিয়াছি, যম আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বিচার করিলেন এবং তৎফলভোগের জন্য আদেশ করিলেন। পরে তদ্দ্বারা মনে হয়, আমি যমের আদেশে স্বর্গে অথবা নরকে চলিলাম।

ঐরূপে স্বর্গ অথবা নরকভোগের অন্তে কাহারও প্রতিভা উদিত হয়, আমাকে সংসারে যাইয়া যোনিজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। ক্রমে বৃষ্টিজলাদিবাহী হইয়া শস্যাদি ও ফলাদি ভাবে ভাবিত হয়। তৎপরে সে ভাব হইতে বীজভাবে ভাবিত হয়। সেই জীবাধিষ্ঠিত পুংবীজ স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় গর্ভরূপে পরিণত হয়। সেই গর্ভই ক্রমে ভূমিষ্ঠ, ক্রমে বালক, ক্রমে যুবা, তৎপরে পুনর্বৃদ্ধ, পুনর্ব্যাধিমরণ, পুনঃ আতিবাহিকদেহী, পুনঃ শ্রাদ্ধসপিণ্ডাদি দ্বারা ভোগযোগ্য শরীরনিষ্পত্তি প্রভৃতি হইতে থাকে বা ভাবিতে থাকে।

প্রাগুক্ত বশিষ্ঠবচন ও সে সকলের এই অনুবাদ পাঠ করিলে অন্তরালঘটিত কোনও প্রশ্নের প্রত্যুত্তর অপ্রাপ্ত থাকিবে না। প্রত্যুত্তরগুলি অসম্ভবও নহে, অযৌক্তিকও নহে। বশিষ্ঠদেব যাহা যাহা বলিয়াছেন, সে সকলের বিরুদ্ধে ঐ সকল কথার মিথ্যাত্বে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে, এমন কোন ন্যায়, তর্ক,

যুক্তি অথবা প্রমাণ, কিছুই নাই। প্রত্যুত ঐ সকলের স্বপক্ষে সাংদৃষ্টিক স্থায় ও প্রাগুক্ত ও পশ্চাদুক্ত যুক্তি বিদ্যমান আছে। যদি কেহ আমাদিগকে বলেন. বোম্বে কলিকাতার মত, তাহা হইলে আমরা কি বক্তার সে কথায় আস্থা করিব না? অবশ্যই করিব। শাস্ত্র যখন পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, ইহ-পর-লোকের অন্তরালটি স্বপ্ন, সম্ভ্রম ও মনোরাজ্যের মত, তখন আর উহার বিরুদ্ধে বলিবার কি আছে? যাহাই বলিবেন, তাহাই স্বপ্ন, সম্ভ্রম ও মনোরাজ্যের দ্বারা বাধিত বা তাড়িত হইবে। স্বপ্ন, সম্ভ্রম ও মনোরাজ্য প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষ, সুতরাং ঐ সকল হয় না বলিবার উপায় নাই। যে কারণে ও যে প্রক্রিয়ায় স্বপ্ন, সম্ভ্রম ও মনোরাজ্য আবির্ভূত হয়, লোকান্তরপ্রস্থিত জীবের অন্তরালও প্রায় সেইরূপ কারণে ও সেইরূপ প্রক্রিয়ায় নির্ব্বাহিত হয়। তবে অন্তরালবর্ণনার মধ্যগত একটি কথার উপর আমাদের কিছু বলিবার কথা আছে। কথাটা এই যে, বশিষ্ঠ বলিলেন,—

"আদৌ মৃতা বয়মিতি বুধ্যন্তে তদনুক্রমাৎ।
বন্ধুপিণ্ডাদিদানেন প্রোৎপন্না ইতি-বেদিনঃ॥"

আগে "আমি মরিলাম" এই জ্ঞান, পরে পুত্রাদি কর্তৃক দাহ-পিণ্ডদানাদির দ্বারা শরীরনিষ্পত্তি হওয়ার জ্ঞান হয়। এ শরীর চিন্তাসৃষ্ট, ভাবময় এবং ভবিষ্যৎ যোনিজন্মের প্রতিরূপ।— এই স্থানে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, পিণ্ডদানাদির সহিত মৃত জীবের সম্পর্ক কি? যদি বলা যায়, সম্পর্ক আছে, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত বা বিশ্বাস্য কি না? অনুসন্ধান দ্বারা আমরা

বিদিত আছি, যাঁহারা শাস্ত্রকে স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া জানেন, অভ্রান্ত মনে করেন, তাঁহাদের মনে ঐ প্রশ্ন উদিত হয় না; পারলৌকিক ক্রিয়ার প্রতি তাঁহাদের যে বিশ্বাস, সে বিশ্বাস অবিচাল্য, অর্থাৎ আঁটা বিশ্বাস। যাঁহারা শাস্ত্রে অবিশ্বস্ত, প্রত্যক্ষ অথবা যুক্তি এই দুইয়ে বিশ্বস্ত, তাঁহাদেরই পক্ষ হইতে ঐ প্রশ্ন উঠে এবং বিশ্বস্ত পক্ষ হইতে তদুত্তর এইরূপে প্রদত্ত হয়।

মীমাংসকদিগের প্রত্যুত্তর এই যে, ক্রিয়ার যে ফল-জননী শক্তি আছে, তদন্তর্গত শক্তিবিশেষের নাম অপূর্ব্ব। ক্রিয়ার সেই অপূর্ব্ব শক্তি, প্রেতশরীরনিষ্পত্তির কারণ হইয়া থাকে।

বৈদান্তিকদিগের প্রত্যুত্তর এই যে, "সর্ব্বাত্মকানি তাবৎ করণানি সর্ব্বাত্মকপ্রাণসংশ্রয়াচ্চ তেষাম্ আধ্যাত্মিকাধিভৌতিক-পরিচ্ছেদঃ প্রাণিকর্ম্মজ্ঞাননিমিত্তঃ। অতস্তদ্‌বশাৎ স্বভাবতঃ সর্ব্বগতানামনন্তানামপি প্রাণানাং কর্ম্মজ্ঞানবাসনানুরূপ্যেণৈব দেহারম্ভবশাৎ বৃত্তিঃ সঙ্কুচতি বিকসতি চ।" কথাগুলির সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক মন ও প্রাণ অনন্ত ও সর্ব্বগামী, সেইজন্য একের সমুৎপন্ন অপূর্ব্বনামধেয় কর্ম্মজ্ঞানসংস্কার দ্বারা অন্যের উপকার-অপকারসাধন অসম্ভব নহে। পিণ্ডদাতা অপূর্ব্ব উৎপাদন করে, সেই অপূর্ব্ব মৃতাত্মার শরীরবাসনা উদ্বুদ্ধ করিয়া দেয়, সুতরাং সে মৃত্যুর পর একাদশ দিবসে আপনার ভাবিশরীরের ভাব নিষ্পন্ন হইতে দেখে।

যোগীরা বলেন, পিণ্ডদানাদি ক্রিয়ার সঙ্গে যে তীব্র ভাবনা উত্থাপনের বিধান আছে, সেই তীব্র ভাবনাই কর্ম্মীদিগের সস্নেহ

অপত্য-ভাবনার দৃষ্টান্তে, প্রেতশরীরনিষ্পত্তির কারণভাব প্রাপ্ত হয়। কূর্ম্মদিগের সস্নেহ অপত্যভাবনার বিবরণ বলিতেছি—

মহাভারতে যুধিষ্ঠির ভগবান্ কৃষ্ণকে সর্ব্বদাই বলিতেন, "মনসা স্নেহ-যোগেন যন্নঃ স্মরসি কেশব। শাবকা ইব কূর্ম্মাণাং তেন জীবামহে বয়ম্॥" হে কেশব! তুমি যে আমাদিগকে সর্ব্বদা সস্নেহমনে স্মরণ কর, তাহাতেই আমরা, যেমন কূর্ম্মশাবকেরা কূর্ম্মদিগের সস্নেহ স্মরণে জীবিত থাকে, তাহার ন্যায় জীবিত রহিয়াছি।

আমরা অনুসন্ধানে বিদিত হইয়াছি, কচ্ছপীরা প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, স্থলে আশ্রয় করে, উঠিয়া স্থলে কোন এক নিভৃত প্রদেশে গর্ত্তমধ্যে ডিম্ব প্রসব করে ও মৃত্তিকার দ্বারা গর্ত্তমুখ ঢাকিয়া দিয়া পুনর্ব্বার জলে প্রবেশ করে। কোথায় প্রসব করিয়াছে, তাহা মনে থাকে না বলিয়াই হউক, কারণান্তর-বশতঃই বা হউক, প্রসবস্থানে আর আইসে না। না আসিলেও গর্ত্তমধ্যস্থ ডিম ৭।৮ দিন পরে ফুটিয়া তন্মধ্য হইতে শাবক বাহির হয়। কচ্ছপী যদি ডিম ফুটিবার পূর্ব্বে মরিয়া যায়, তাহা হইলে ডিম সমস্তই পচিয়া যায়; একটিও শাবক হয় না। কোন কোন জালজীবী, ব্যাপারটা বা প্রবাদটা সত্য কি না, পরীক্ষার জন্য কচ্ছপীকে মারিয়া ফেলিয়াছে, ডিম সমস্তই পচিয়া গিয়াছে, একটিও শাবক জন্মে নাই। তাই জলজীবীদিগের সিদ্ধান্ত, শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও বটে, কচ্ছপীর সস্নেহ ভাবনার (চিন্তার) প্রবাহে কচ্ছপশিশুরা জীবিত থাকে। এই বিষয়ে আমরাও বুঝি ও বলি, কচ্ছপীর দৃষ্টান্ত গ্রহণ না করিলেও,

ততদূর অনুসন্ধান না করিলেও বিদেশস্থ স্নেহাস্পদদিগের বিপত্তিঘটিত চিন্তার ফলাফল বিচার করিলেও আমরা চিন্তাসহকৃত পিণ্ডদানাদির সাফল্যে বিশ্বস্ত হইতে পারি। প্রায়ই শুনা যায় ও নিজেরাও এক এক সময়ে অনুভব করিয়াছি, সহসা প্রাণের মধ্যে একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে এবং এই ব্যাকুলতার অত্যল্প পরেই সংবাদ আসিল, ঠিক সেই সময়টাতে বিদেশস্থ স্নেহাস্পদ পুত্রাদির অথবা শ্রদ্ধাস্পদ পিতা-মাতার বিপত্তি ঘটিয়াছে; এবং তৎসঙ্গে ইহাও শুনা গেল যে, সেই ব্যক্তি কোথায় পুত্র, কোথায় পিতা, অথবা কোথায় মাতা বলিয়া রোদন করিয়াছিল। অতএব বিপত্তিকালের তীব্র চিন্তাই যে সেই সেই ব্যক্তির প্রাণে সেই সেই উৎকণ্ঠা ও সেই সেই প্রকারে আঘাত উপস্থিত করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই আমরা বুঝি ও বলি, পৃথিবীর এতৎপ্রান্তস্থ ব্যক্তির চিন্তাবিশেষ যদি অপরপ্রান্তস্থ ব্যক্তির প্রাণে আঘাত উপস্থিত করিতে পারে, তাহা হইলে শোককাতর পুত্রের চিন্তা ও তৎসহ পিণ্ডদানক্রিয়া প্রেতের প্রাণেও শরীরনিষ্পত্তিবোধ উপস্থাপিত করিতে পারে। যাঁহারা এই সকল কথায় ও এই সকল দৃষ্টান্তে প্রণিধান করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের অপর বক্তব্য এই যে, যাঁহারা ইংরাজদিগের প্রচারিত Mismerism, Hipnetism, Spiritualism, Will-Force, Sympathical Telegraph প্রভৃতি বিশ্বাস করেন, তাঁহারা হিন্দুর প্রেতপিণ্ডদানাদির ব্যাপারের সাফল্যে বিশ্বাস না করিবেন কেন? শেষোক্ত Sympathical

Telegraph-এর বিবরণ এই যে, এই পৃথিবীতে শম্বুকজাতীয় এক শ্রেণীর প্রাণী আছে। জনৈক ইউরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ সেই শ্রেণীর প্রাণী সংগ্রহ করিয়া অন্য একপ্রকার টেলিগ্রাফ (Telegraph) সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি তাহাদের স্ত্রী, পুরুষ, মাতা, পুত্র চিনিয়া লইয়া স্ত্রীকে একস্থানে ও অন্য পুরুষকে অন্যস্থানে, তথা মাতাকে একস্থানে ও পুত্রকে অন্যস্থানে রাখিয়া দেন, অনন্তর তাহাদের একতরের অঙ্গে কাঁটা ফুটাইয়া দিয়া যাতনা প্রদান করিতে থাকেন। পরে দেখিতে পান, কণ্টকবিদ্ধ শম্বুকটি যে প্রকার যাতনার ভাব প্রকাশ করিতেছে, অন্য অবিদ্ধ শম্বুকটিও ঠিক সেই প্রকার যাতনার ভাব প্রকাশ করিতেছে। অদ্যাপি এই ব্যাপারের পরীক্ষা চলিতেছে, ব্যবহারযোগ্য অবস্থা অদ্যাপি প্রাপ্ত হয় নাই। আমাদের দেশে এই শ্রেণীর শম্বুক আছে কি না, জানি না এবং যে জাতীয় শম্বুক আছে, তাহাদের স্বভাবে ঐরূপ Sympathy (সমবেদনধর্ম্ম) আবিষ্ট আছে কি না, তাহাও জানি না; তথাপি এরূপ বলায় বোধ হয় দোষ হইবে না যে, যাঁহারা এই Sympathical Telegraph ব্যাপার বিশ্বাস করিবেন, তাঁহাদের পুত্রকৃত পিণ্ডদানাদি ব্যাপার সফল বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে আর এক প্রশ্ন উঠিতে পারে, সে প্রশ্নেরও মীমাংসা হওয়া উচিত। সে প্রশ্ন - যাহার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানাদি-ক্রিয়া নির্ব্বাহিত না হয়, তাহাদের তাৎকালিক গতি কি হয়? তাহাদের কি ভাবময় শরীর নিষ্পন্ন হয় না? এই প্রশ্নের

সমাধান সেই বশিষ্ঠদেবই করিয়াছেন, তজ্জন্য আমাদিগকে কোনরূপ নূতন পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে না। যথা—

"রাম উবাচ

ভগবন্। পিণ্ডদানাদিবাসনারহিতাকৃতিঃ।
কীদৃক্ সম্পদ্যতে জীবঃ পিণ্ডো যস্মৈ ন দীয়তে॥

বশিষ্ঠ উবাচ

পিণ্ডোঽথ দীয়তে মা বা পিণ্ডো দত্তো মমেতি চেৎ।
বাসনা হৃদিসংরূঢ়া তৎপিণ্ডফলভাঙ্ নরঃ॥
যচ্চিত্তং তন্ময়ো জন্তুর্ভবতীত্যনুভূতয়ঃ।
স দেহেষু বিদেহেষু ন ভবত্যন্যথা কচিৎ॥
সপিণ্ডোঽস্মীতি সংবিত্ত্যা নিষ্পিণ্ডোঽপি সপিণ্ডবান্।
যথাভাবনমেতেষাং পদার্থানাং হি সত্যতা॥
ভাবনা চ পদার্থেভ্যঃ কারণেভ্য উদেতি হি।
যথা ভাবনয়া জন্তোর্বিষমপ্যমৃতায়তে।
অসত্যঃ সত্যতামেতি পদার্থো ভাবনাবলাৎ॥

রাম উবাচ

ধর্ম্মো নাস্তি মমেত্যেব যঃ প্রেতো বাসনান্বিতঃ।
তস্য চেৎ সুহৃদা ভূরি-ধর্ম্মঃ কৃত্বা সমর্পিতঃ॥
তত্তদাঽত্র স কিং ধর্ম্মো নষ্টঃ স্যাদুত বা ন বা।
সত্যার্থা বাপ্যসত্যার্থা ভাবনা কিং বলাধিকা॥

বশিষ্ঠ উবাচ

দেশকালক্রিয়াদ্রব্যসম্পত্ত্যোদেতি ভাবনা।
যত্রৈবাভ্যুদিতা সা স্যাৎ স দ্বয়োরধিকো জয়ী॥

ধর্মদাতুঃ প্রবৃত্তা চেৎ বাসনা তত্তয়া ক্রমাৎ।
আপূর্য্যতে প্রেতমতির্ন চেৎ প্রেতধিয়া শুভা॥
এবং পরস্পরজয়াৎ জয়ত্যত্রাতিবীর্য্যবান্।
তস্মাচ্ছুভেন যত্নেন শুভাভ্যাসমুদাহরেৎ॥"

যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহাদের জন্য বশিষ্ঠবচন-গুলির স্থূল তাৎপর্য্য বাঙ্গালা ভাষায় সন্দর্ভিত করা হইল।—

রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন, "ভগবন্! যাহাদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানাদিক্রিয়া না হয়, কিরূপে তাহাদের শরীরদর্শন সিদ্ধ হইবে?"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "রাম! বন্ধুজনেরা পিণ্ড দিউক বা না দিউক, 'পিণ্ড দিয়াছে' ইত্যাকার বাসনা উদিত হইলেই প্রেতের শরীরদর্শন সিদ্ধ হয়। ফলতঃ পিণ্ডদানাদিক্রিয়া পুত্রাদির কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত ও প্রেতের পক্ষে উহা অবশ্যম্ভাবের বোধক। অর্থাৎ বন্ধু কর্তৃক পিণ্ডদান নির্ব্বাহিত হইলে, মৃত-ব্যক্তির পিণ্ডদানবাসনা জন্মিবার প্রতিবন্ধক কাটিয়া যায়। সেইজন্য বলা হইয়াছে, পিণ্ডদান না করিলেও, প্রেতগত পিণ্ডদানবাসনার উদ্রেক অনিবার্য্য; সুতরাং উহা প্রেতের শরীরদর্শনসিদ্ধির কারণ বলিয়া গণ্য। প্রতিবন্ধক থাকিলে, তাহার নাশক কারণ হয়। ফলতঃ শরীরনিষ্পত্তির কারণ নহে। যেহেতু শরীরদর্শনসিদ্ধির কারণ বাসনার উদ্রেক, সেই হেতু যাবৎ বাসনার অনুদ্রেক, তাবৎ শরীরদর্শন অসিদ্ধ বা অনিষ্পন্ন থাকে। বিনা পিণ্ডদানেও প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ বাসনা উদ্রিক্ত হইলে নিষ্পিণ্ড প্রেতও সপিণ্ডফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভাবনার এমনি প্রভাব যে, সত্য অসত্যে পরিণত হয় এবং অসত্য সত্যে পরিণত হয়। ভাবনার প্রভাবে বিষও অমৃতের ন্যায় কার্য্যকরী হয় এবং অমৃতও বিষের ন্যায় কার্য্যকরী হয়। যাহারা গরুড়-উপাসনায় সিদ্ধ, তাহাদিগের নিকট বিষ অমৃত। যাহারা অসিদ্ধ, তাহারা কণ্টকবেধ ও পিপীলিকাদংশনকে সর্পদংশন ভাবনায় ভাবিত হইয়া বিষের কার্য্য অনুভব করে।"

রাম পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! যে প্রেতের 'আমার কিছুমাত্র ধর্ম্ম নাই' ইত্যাকার বাসনা উদিত হইতে থাকে, তদীয় পুত্রাদি যদি প্রচুর ধর্ম্ম করিয়া প্রেতের উদ্দেশ্যে দান করে, তাহা হইলে সুহৃদ্‌দিগের ধর্ম্মদানবাসনা সফল হইবে, কি নিষ্ফল হইবে?"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "যে স্থলে প্রেতবাসনা অপেক্ষা সুহৃদ্‌বাসনার বলাধিক্য, সে স্থলে সুহৃদ্‌বাসনাই দুর্ব্বল প্রেতবাসনাকে অভিভূত করিয়া ফল প্রদান করিবে এবং যে স্থলে প্রেতবাসনা সুহৃদ্‌বাসনা অপেক্ষা প্রবল থাকে, সে স্থলে সুহৃদ্‌বাসনা অভিভূত ও নিষ্ফল হইবে। সমুদায় কথার সারসংগ্রহ এই যে, পিণ্ডদানাদি ক্রিয়ার পর মৃতব্যক্তির শরীরবাসনা উদিত হয়, তৎপ্রভাবে সে তখন আপনাকে নিষ্পন্নশরীর দেখে। পরন্তু একাদশ দিনে দেখিবে, কি পঞ্চাশৎ দিনে দেখিবে, তাহার স্থিরতা নাই। যখন তাহার শরীরবাসনা উদ্রিক্ত হইবে, তখনই সে আপনাকে শরীরসম্পন্ন দেখিবে। সুতরাং পিণ্ডদানাদি ক্রিয়া প্রেতের বাসনাকে কার্য্যোন্মুখী মাত্র করায়, শরীর নির্ম্মাণ করিয়া দেয় না।

জীব কর্ম্মফলভোগের জন্য পরলোকগমন করে। তাহার

কৃতকর্ম্ম তাহাকে ভবিষ্যতে যে যোনিতে লইয়া যাইবে, সেই যোনিরই প্রতিরূপ যোনি সে মরণের পরই ভাবনার দ্বারা গঠন করিয়া লয়। অর্থাৎ প্রথমে তাহার ভাবময় শরীর হয়, পরে তাহা যোনিপ্রবিষ্ট হইয়া ভূতসংযোগে স্থূলে পরিণত হয়। কর্ম্মের প্রভাবে স্থাবর, জঙ্গম, দেব, মনুষ্য, সর্ব্বপ্রকার শরীর হওয়া সুসম্ভব। যে শরীর হউক না কেন, সকল শরীরেরই তৃপ্তি-অতৃপ্তি থাকে। সেই তৃপ্তি-অতৃপ্তি বন্ধুদত্ত পিণ্ডাদিদানের ও অদানের আনুষঙ্গিক ফল। শাস্ত্রকারদিগের লেখাতেও ঐ অভিপ্রায় প্রকাশ পায়। যথা—

"শ্রদ্ধাসমন্বিতৈর্দ্দত্তং পিতৃণাং নামগোত্রতঃ।
যদাহারাস্তু তে জাতাস্তদাহারত্বমেতি তৎ॥
দেবো যদি পিতা জাতঃ শুভকর্ম্মানুযোগতঃ।
তস্যান্নমমৃতং ভূত্বা দেবত্বেঽপ্যনুগচ্ছতি॥
দৈত্যত্বে ভোগরূপেণ পশুত্বে চ তৃণং ভবেৎ।
শ্রাদ্ধন্তু বায়ুরূপেণ নাগত্বেঽপ্যুপতিষ্ঠতে॥
দনুজত্বে তথা মদ্যং প্রেতত্বে রুধিরোদকম্।
মনুষ্যত্বেঽন্নপানাদি নানাভোগরসং ভবেৎ॥"

—ইত্যাদি।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরলোককথার প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলা আবশ্যক বোধ করিলাম। জীব অন্তরালভোগের পর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে, এই সিদ্ধান্ত কর্ম্মভূমি ভারতে বহুকালাবধি প্রতিষ্ঠিত। পরন্তু আজকাল নানা ভোগভূমির নানা মানব ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ মনে করেন ও বলেন, আদিকালে মনুষ্যসংখ্যা খুব কম ছিল, পরে দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া প্রচুর হইয়াছে, ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইবে। নূতন নূতন আত্মা না জন্মিলে এইরূপ মনুষ্যবৃদ্ধি কিরূপে হইতে পারে? পরন্তু তাঁহাদিগের ইহাও বুঝা উচিত যে, আদিমকালে যেমন মনুষ্যজীব অল্প ছিল, তেমনি পশ্বাদি বৃহৎ জীব ও কীটপতঙ্গাদি ক্ষুদ্র জীব অধিক ছিল। জীব নরকভোগ অন্তে তির্য্যক্‌শরীর পায়, পরে আবার মনুষ্যজীব হয়। এই নিয়মের অনুবর্ত্তনেই মনুষ্য বাড়িয়াছে এবং পশ্বাদি ও কীটপতঙ্গাদি জীব কমিয়াছে, এরূপ বা এরূপ ঘটনা হওয়ার বাধা কি? পৃথিবীতে সময়ে এতদধিক মনুষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, আবার সময়ে সময়ে কমিয়া গিয়াও থাকে। মধ্যে মধ্যে মনুষ্যজীববাহুল্যে ও তাহাদের দৌরাত্ম্যে পৃথিবী ভারাক্রান্তা হন, তাই ভগবান্‌ও মধ্যে মধ্যে ভূভারহরণ জন্য এক একবার অবতীর্ণ হন। যাঁহারা ভাবেন, আত্মা অমর, মরণের পরে থাকে, কিন্তু পুনর্জ্জন্ম হয় না – শ্রুতি, যুক্তি উভয়

প্রমাণ তাঁহাদের প্রতিপক্ষ। জন্মে অথচ অমর, এরূপ উদাহরণ নাই। অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাঁহারা যুক্তি উদ্ভাবনপূর্ব্বক পুনর্জ্জন্ম নিষেধ করিতে অসমর্থ। সুতরাং তাঁহাদের প্রোক্ত অভিপ্রায় মোহমূলক ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আস্তিক ও নাস্তিক উভয় দলের মধ্যে এরূপ ও অনুরূপ অনেক আপত্তি ও প্রত্যাপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা যে-সকল আপত্তি ও প্রত্যাপত্তি শুনিয়াছি, যে সকলের কিয়দংশ এই—

আপত্তি।—আত্মা অজর, অমর। সুতরাং এই আত্মা, পূর্ব্বে এইরূপ একটা দেহ পাইয়াছিল, ইহা যদি সত্য হয়, তবে সে কথা স্মরণ হয় না কেন? যখন জন্মান্তরীয় কোন বিষয় স্মরণ হয় না, তখন কিসে বিশ্বাস হইবে যে, আমি ছিলাম ও আমার পূর্ব্বজন্ম ছিল?

প্রত্যাপত্তি।—তোমার বয়স যখন এক বৎসর, তখন তুমি কিরূপ ছিলে, বলিতে পার? শৈশবকালের কথা দূরে থাক্—কল্যকার সমগ্র কথা স্মরণ করিয়া বলিতে পার? যখন তাহা পার না, তখন জন্মান্তরের কথা মনে পড়ে না কেন? এ আপত্তি করিতে পার না।

আপত্তি।—জন্মান্তরবাদীরা বলেন, মানুষ মরিয়া অশ্ব হইতে পারে, এ কথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? অশ্ব হইতে অশ্বই হয়, মানুষ হয় না। মানব হইতেও অশ্ব হয় না। এ সকল দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, মানবাত্মা অশ্ব হয় না।

প্রত্যাপত্তি।—শরীরোৎপত্তির বীজ আত্মাও নহে, দেহও নহে। শরীরোৎপত্তির বীজ কর্ম্মাশয় অর্থাৎ

অনুষ্ঠিত জ্ঞানের ও কর্ম্মের পুঞ্জীভূত সংস্কার। সেই কারণে, মানবদেহ পাইয়া জীব যদি নিরন্তর অশ্বধ্যান করে, কি অশ্বশরীর জন্মিবার অন্যবিধ কারণকূট সংগ্রহ করে, তাহা হইলে ভাবী জন্মে তাহার অশ্বশরীর না হইবে কেন?

আপত্তি।—মানিলাম, পূর্ব্বজন্মে যে মানুষ ছিল, কর্ম্মফলে ইহজন্মে সে অশ্ব হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত মনুষ্যোচিত জ্ঞান কোথায় গেল? অশ্বশরীরোচিত জ্ঞানই বা তাহার কোথা হইতে আসিল?

প্রত্যাপত্তি। "কারণানুবিধায়িত্বাৎ কার্য্যাণাং তৎস্বভাবতা।
নানাযোন্যাকৃতীঃ সত্ত্বে ধত্তেঽতো দ্রুতলোহবৎ॥"

যাহা, যাহা হইতে জন্মে, তাহা তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এই নিয়মের অনুগুণে নানা যোনি হইতে নানা আকারের জীব জন্মিতেছে। দ্রবীকৃত লৌহ ছাঁচের আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অন্যাকার হয় না। জীব যখন যে যোনিতে উৎপন্ন হয়, তখন সে যোনির অনুরূপ আকার ও স্বভাব প্রাপ্ত হয়। প্রাক্তন সংস্কার অধিক পরিমাণে অভিভূত হইয়া থাকে, সেই কারণে অশ্বের মানবীয় জ্ঞান লুপ্ত থাকে ও অশ্বের আকার এবং স্বভাব ব্যতীত মানবের আকার ও স্বভাব হয় না।

আপত্তি।—অনুমান হয়, মানব-আত্মা ক্রমোন্নতিস্বভাবাপন্ন, ক্রমে উন্নত ভিন্ন অবনত হয় না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে—তাহার শৈশব, কৌমার, পৌগণ্ড, যৌবন এই সকল অবস্থা। এই সকল অবস্থা ক্রমোন্নতির অনুমাপক। যখন দেখা যাইতেছে, আত্মা ক্রমেই উন্নত হয়, অবনত হয় না, তখন সে

মরিয়া আবার জন্মিবে, আবার শিশু হইবে, আবার অজ্ঞানের দশায় ও অনুন্নতির দশায় পড়িবে, ইহা নিতান্ত অবিশ্বাস্য।

প্রত্যাপত্তি।—তোমাদের বিশ্বাসকে ধন্য! যুক্তিকেও ধন্য! বালক হইতে যুবা পর্য্যন্ত দেখাইয়া বলিলে, আত্মা ক্রমোন্নতিস্বভাব। কিন্তু বৃদ্ধের উল্লেখ করিলে না। বৃদ্ধ হইলে, অতিবৃদ্ধ হইলে, মনুষ্য যে ভীমরথী হয়, তাহা কি দেখ নাই? সে অবস্থা বাল্য অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও অবনতির অবস্থা। তদ্দৃষ্টান্তে বুঝা উচিত যে, সংসারী আত্মা ক্রমোন্নতিস্বভাব নহে, কিন্তু উন্নতাবনিত উভয়বিধস্বভাবাপন্ন। সেই জন্যই সংসারী আত্মা (জীব) স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান-কর্ম্ম অনুসারে কখনও উন্নত হয়, কখনও বা অবনত হয়, কখনও উৎকৃষ্ট দেহ পায়, কখনও বা নিকৃষ্ট দেহ পায়। অতএব "জন্মান্তর নাই" এ পক্ষে কোন সত্যপূর্ণ সদ্‌যুক্তি নাই। বরং জন্মান্তরের অস্তিত্ব পক্ষে অনেক সদ্‌যুক্তি আছে। যথা - "সর্ব্বস্য প্রাণিনামিয়মাত্মাশীর্নিত্যা ভবতি মা ন ভূবম্ ভূয়াসমেবেতি। ন চাননুভূতমরণধর্ম্মকস্যৈষা ভবত্যাশীঃ। এতয়া চ পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে।" [যোগভাষ্যে ব্যাস]

১। প্রাণিমাত্রেরই একটি নিত্য ও নিয়মিত অভিনিবেশ অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রার্থনা আছে। তাহার আকার—যেন মরি না ও থাকি। জীবমাত্রেই মরিতে চায় না। মরণের প্রতি তাহাদের বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায়। যত প্রকার ভয় বা ত্রাস আছে, সর্ব্বাপেক্ষা মরণত্রাস অধিক বলবান্ ও অনিবার্য্য। মরণত্রাস সদ্যজাত শিশুতেও দৃষ্ট হয়। যে কখন মরণযাতনা অনুভব করে নাই, অন্যের মরণ দেখে নাই, শুনেও নাই, কোনও

প্রকারে মরণত্রাস অনুভব করে নাই, তাদৃশ ব্যক্তির অন্তরেও মারক বস্তু উপস্থিতে ত্রাস জন্মে। কেন? তাহা বলিতেছি। মরণে যদি ক্লেশ থাকে এবং যদি তাহা আর কখনও অনুভূত হইয়া থাকে, তবেই মারক বস্তু উপস্থিতে ত্রাসকম্পাদি উপস্থিত হইতে পারে; নচেৎ পারে না। সুতরাং বিশ্বাস করা উচিত যে, জন্মান্তরীয় মরণদুঃখ ভোগের বা অনুভবের সংস্কার তাহার অন্তরিন্দ্রিয়ে লুক্কায়িত ছিল, অদ্য তাহা অজ্ঞাতসারে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভীত ও কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষতঃ সদ্যোজাত বালকের মরণত্রাসের সঙ্গে ইহজন্মের সম্বন্ধ দেখা যায় না। তাহাতেও জন্মান্তর অনুমিত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে ত্রিকালদর্শী ঋষিমাত্রেই বলিয়া গিয়াছেন, জীবের জীবস্বভাবের অন্তর্গত মরণত্রাস পূর্ব্বজন্ম থাকার চিহ্ন।

সদ্যোজাত শিশু পূর্ব্বদেহে মরণক্লেশ অনুভব করিয়াছিল, তজ্জনিত সংস্কার তাহার চিত্তে আহিত ছিল, এক্ষণে মারক পদার্থ উপস্থিতে তাহার সেই সংস্কার অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতসারে অপরিস্ফুটরূপে উদ্বুদ্ধ হইল, অমনি ত্রাস জন্মিল, চিত্ত কাঁপিয়া উঠিল। সে ত্রাস কোন সাক্ষাৎ কারণে উপস্থিত হয় নাই, মাত্র সংস্কারপ্রভাবে উদিত হইয়াছে সেই কারণে তাহা পূর্ব্ব-মরণ-ক্লেশের প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ সেই জন্যই আমি আর একবার মরিয়াছিলাম, মরণের ক্লেশ বড় ক্লেশ ইত্যাদি প্রকার বৃত্তান্ত বা ক্লেশের সমুদায় আকার স্মরণ হয় না। তাহা না হইবার হেতু এই যে, সে উদ্বোধ কোন সাক্ষাৎ কারণে উপস্থিত হয় নাই। যে সকল অভ্যস্ত বিষয়

ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র অন্তর্হিত সংস্কারের স্বতঃ উদ্বোধপ্রভাবে উদিত হয়, সে-সকল যার-পর-নাই অস্পষ্ট। তাহা প্রতিচ্ছায়া বা অভ্যাসমাত্র। অত্যন্ত বিস্মৃত বিষয়ের ঐরূপ উদ্বোধই হইয়া থাকে, পরিপুষ্ট উদ্বোধ হয় না।

ইচ্ছা।—ইচ্ছা একটি আত্মগুণ বা আত্মলগ্ন শক্তিবিশেষ। ভাবিয়া দেখ, কিরূপ কারণে তাহা উদিত হইয়া থাকে। ইচ্ছার জনক সৌন্দর্য্যজ্ঞান। ভাল বলিয়া অনুভব না হইলে এবং ইহা আমার অনুকূল বা উপকারক, এ বোধ না হইলে কোনক্রমে তদ্বিষয়ে ইচ্ছোদ্রেক হইবে না। ইচ্ছার ন্যায় ভয়, ত্রাস, প্রবৃত্তি, সমুদায় অন্তর্বৃত্তির প্রতি ঐ নিয়ম চিরপ্রতিষ্ঠিত। অতএব সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও ত্রাস প্রভৃতির সহিত যখন ইহজন্মের সেরূপ কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না, তখন অবাধে বলিতে ও মানিতে পারা যায় যে, সে সকলের সহিত পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সেই সেই সংস্কার তাহার সেই সেই বিষয়ে রুচি, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি প্রভৃতি জন্মাইয়া চরিতার্থ হয়। অতএব সদ্যোজাত শিশুর প্রথম স্তন্যপান-প্রবৃত্তিও জন্মান্তর থাকার দ্বিতীয় চিহ্ন। শতবর্ষ বয়সের বৃদ্ধও শরীর-নিরপেক্ষ জ্ঞানে আপনার বৃদ্ধত্ব অনুভব করে না। সে যখন নিজ শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের প্রতি লক্ষ্য করে, তখনই সে বুঝে, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। এ নিয়ম বালকেও বিদ্যমান আছে। আত্মা অজর অমর বলিয়াই ঐরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। আত্মা বৃদ্ধ হয় না, মরেও না, তদাশ্রিত দেহই বৃদ্ধ হয় ও মরে। সুতরাং আত্মার অমরত্ব ও দেহের পরিবর্ত্তন এই দুইয়ের দ্বারা জন্মান্তর থাকা

অনুমিত হয়। বিদ্যা-বুদ্ধি সকলের সমান না হওয়া জন্মান্তর থাকার অন্যতম চিহ্ন। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা দশ বৎসরেও সামান্য রঘুবংশ কাব্য বুঝিতে অক্ষম; কিন্তু তাহারা যার-পর-নাই কঠিন ভাবগত শাস্ত্র সহজে বুঝিতে পারে।

আগ্রহ অর্থাৎ ঝোঁক।—ইহার অন্য নাম প্রবৃত্তি-নির্ব্বন্ধ। এই আগ্রহও জন্মান্তর থাকার অনুমাপক। এক এক বিষয়ে এক এক জনের এমন এক অনিবার্য্য ঝোঁক থাকে যে, যষ্টির আঘাত করিলেও সে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না। তাদৃশ আগ্রহ বা ঝোঁক পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বা অভ্যাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

জীববিশেষের স্বভাব ও কর্ম্মবিশেষ পূর্ব্বজন্ম থাকা সপ্রমাণ করিতে সমর্থ। সদ্যঃপ্রসূত শাখামৃগের শাখা আক্রমণ ও সদ্যঃপ্রসূত গণ্ডার-শিশুর পলায়ন-বৃত্তান্ত ভাবিয়া দেখিলে অবশ্যই পূর্ব্বজন্মের প্রতি অবিশ্বাস দূরে পলায়ন করিবে। বিশেষত খড়্গী পশুর স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে জন্মান্তর আছে।

কেবল আমরা বলি না, অনেক পশুতত্ত্ববিৎ ইংরাজ পণ্ডিতও বলিয়াছেন যে, গণ্ডারী শাবক প্রসব করিয়া কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান অভিভূত হইয়া থাকে। পরে যখন সে সন্তানের গাত্র লেহন করিতে যায়, তখন আর তাহাকে দেখিতে পায় না। কারণ এই যে, গণ্ডার-শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পলায়ন করে। ৫।৭ দিন পরে আবার উভয়ে উভয়ের অন্বেষণ করিয়া একত্র হয়। এই বৃত্তান্ত দেখিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, স্বভাবের সামর্থ্যেই হউক, আর ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশলেই হউক অথবা

জন্মান্তরীয় সংস্কারের বলেই হউক, গণ্ডার শিশু বুঝিতে পারে, আমার মা আমাকে লেহন করিবে; করিলে আমার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইবে। পাছে মা গা চাটে, সেই ভয়ে গণ্ডার-শাবক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পলায়ন করে, পরে গাত্রচর্ম্ম ৫।৭ দিনে কাঠিন্য প্রাপ্ত হইলে, তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরকে খুঁজিয়া লয়। বস্তুতঃ গণ্ডারীয় জিহ্বায় এত ধার যে, বৃক্ষ লেহন করিলে বৃক্ষের ত্বক্ উঠিয়া যায়। গণ্ডার-পশুর এই অদ্ভুত স্বভাব পূর্ব্বজন্ম থাকার অনুমাপক। সে অনুমান পরম্পরা-ঘটিত, সাক্ষাৎ নহে। অর্থাৎ গর্ভসঞ্চারকালেও আত্মার বিদ্যমানতা ছিল, অস্থিমাংসাদির ন্যায় নূতন উৎপত্তি হয় নাই। নূতন উৎপত্তি না হওয়ায় আত্মার পুরাতনত্ব ও তৎসঙ্গে তাহার আশ্রয় বা দেহান্তর থাকা অনুমিত হইতে পারে। এইরূপ এত উদাহরণ বিদ্যমান আছে যে, সে সকলের রহস্যচিন্তা করিলে স্থিরবুদ্ধি মনুষ্যমাত্রেই জন্মান্তরে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জন্মান্তর ও প্রেতযোনি

পুনর্জ্জন্মগ্রহণের যাত্রী কিছুকাল পর্য্যন্ত প্রাগ্বর্ণিত অন্তরাল অবস্থা ভোগ করে। ক্রমে পুনর্জ্জন্মগ্রহণের যোগ্য হইলে ও তাহার কাল আসিলে, কর্ম্মানুযায়ী জন্মপ্রাপ্ত হয়। কে কতকাল অন্তরাল ভোগ করে, তাহার অবধারণ নাই। কর্ম্ম অনিয়তস্বভাব বলিয়া অন্তরালভোগের কালসংখ্যা অবধারণ করা অসম্ভব। সম্ভব অসম্ভব পর্য্যালোচনা করিয়া ঋষিরা মাত্র এই কথা বলিয়া গিয়াছেন যে, কেহ এক বৎসর, কেহ বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিককাল অন্তরাল ভোগ করে, তৎপরে "ভোগদেহং প্রপদ্যতে" ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। কাহার কিরূপ ভোগদেহ হইবে, কিরূপ যোনিজন্ম হইবে, তাহা বুঝা ও বলা দুঃসাধ্য। যেহেতু, কর্ম্মই জীবকে যোনিজন্ম ভোগ করায়, সেই হেতু শাস্ত্রের নির্ণয়, "যথা কর্ম্ম তথা শ্রুতম্" অর্থাৎ যাহার যেরূপ কর্ম্ম, যেরূপ ধর্ম্ম, যেরূপ জ্ঞান, সে তদনুরূপ যোনিতে গিয়া উৎপন্ন হয়। এই পুনর্জ্জন্মগ্রহণে জীবের স্বাধীনতা নাই বলিলেও বলা যায়। কোনও জীব সাধারণতঃ অভিসন্ধি-পূর্ব্বক, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, অথবা স্ববশে যোনিজন্মগ্রহণ করিতে পারে না। প্রায় সকলেই সোপার্জ্জিত ধর্ম্মাধর্ম্মাদির প্রেরণায় অবশ হইয়া যোনিজন্ম গ্রহণ করে। যেমন কর্ম্ম ও জ্ঞান অসংখ্যবিধ

তেমনি ফলভোগ ও তাহার স্থানপ্রাপ্তিও অসংখ্যবিধ। ঋষিরা দেহজন্মের স্থানগুলিকে যোনি বলেন এবং তাহা কত প্রকার, তাহাও সংখ্যা নির্দ্দেশপূর্ব্বক উপদেশ দেন। ঋষিরা বলেন, যোনি চতুরশীতিলক্ষ প্রকার; কিন্তু ঋষিবাক্যের ব্যাখ্যাকার আচার্য্যেরা বলেন, ঋষির অভিহিত চতুরশীতিলক্ষ শব্দ অসংখ্যের উপলক্ষণ অর্থাৎ অসংখ্য। আমাদের দেশে ও শাস্ত্রে যে ভূতযোনি বলিয়া একটা কথা আছে, সে কথা উক্ত অসংখ্য জীবযোনির আন্তর্গণিক। ভূতযোনি বা প্রেতযোনি আছে কি নাই, এরূপ সন্দেহ হইতে পারে, পূর্ব্বপক্ষ উঠিতেও পারে; পরন্তু নাই বা মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কেন না, ক্ষুদ্র বৃহৎ এমন অনেক প্রাণী আছে, যাহাদের নিকট আমাদের অস্তিত্ব নাই। সেই জন্য ভূতযোনি নাই বা মিথ্যা বলিয়া অবধারণ বা সিদ্ধান্ত করা যায় না। আমরা যেমন এই পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা উচ্চ, এইরূপ অন্যলোকে আমাদের অপেক্ষা উচ্চ প্রাণী থাকা সম্ভব বৈ অসম্ভব নহে সেই সম্ভব অনুসারে আমরা ও আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা তির্য্যগ্‌যোনি অপেক্ষা মনুষ্যযোনি ও মনুষ্যাপেক্ষা দেবযোনি উচ্চ বলিয়া বর্ণন করি ও করেন। প্রস্তাবিত ভূতযোনি সেই দেবযোনির অন্তর্গত। দেবযোনির অন্তর্গত হইলেও শুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ও ভোগ, এই তিন বিষয়ে ভূতযোনির নিকৃষ্টতা এবং তদনুসারে ভূতযোনির প্রাণী অপদেবতা বলিয়া গণ্য। এই ভূতযোনির প্রাণীরা সূক্ষ্মশরীরী বিধায় স্থূলশরীরী মানব অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে ক্ষমতাধিক্য ধারণ করে বটে, পরন্তু উহারা মনুষ্যাপেক্ষা

অনেক অংশে দুঃখবহুল। সেই জন্য "তত্রাস্য যাতনা ঘোরা শীতবাতাতপোদ্ভবা" এইরূপে শাস্ত্রলেখকেরা উহাদিগকে নারকদেহী বলিয়া বর্ণন করেন। আমরা আমাদের যাতনা-নিবারণে অনেকটা আত্মবশ, দেবতারা আপনাদের দুঃখনিবারণে আমাদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীন; পরন্তু প্রেতেরা আপনাদের দুঃখনিবারণে সম্পূর্ণ পরবশ বা অস্বাধীন। এই কারণে কোন কোন প্রেত অসহ্য যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া সুহৃদ্-স্বজনদিগকে পিণ্ডদানাদি ক্রিয়ায় উত্তেজিত করিবার জন্য দেখা দেয় এবং কেহ বা আত্মগোপনকরতঃ অর্থাৎ অদৃশ্য থাকিয়া নানা আকারের সঙ্কেত প্রদর্শন করে। "তাদৃগ্ভাববয়োঽবস্থাকৃতৈঃ সম্ভাবয়ন্তি তে" অর্থাৎ যে ভাবে, যে বয়সে, যে অবস্থায় ও যে আকারে দেহত্যাগী হইয়াছিল, প্রেতেরা ঠিক সেই ভাবে, সেই বয়সে, সেই অবস্থায় ও সেই আকারে দেখা দিতে পারে, ইহা শাস্ত্রলেখকদিগের মত। শাস্ত্রলেখক কেন, ভূতের ঐ শক্তি ভূতচালকদিগের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। ভূতচালক ইংরাজ ও ভূতচালক বাঙ্গালী, সকলেই ভূতদিগের ঐ শক্তি থাকার কথা বলেন, জল্পনা করেন ও নানাপ্রকার পুস্তক লিখিয়া প্রচারিত করিতেও উদাসীন নহেন। আমরাও ১০।৫টা ভূতের গল্প জানি, ২।১ খানি বহি লিখিলেও লিখিতে পারি, পরন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন; তবে খুব বিশ্বস্ত বলিয়া, পুস্তিকার অবয়ব বাড়িবে বলিয়া এবং বিস্ময়রসের অল্প একটু ছিটা পড়া ভাল মনে করিয়া অতিক্ষুদ্র তিনটি গল্প লিখিলাম।

আমার বাসভূমির অনতিদূরে একটি ছোটখাট পল্লীগ্রাম

কিছুদিন পূর্ব্বে এই গ্রামে তারাচাঁদ ও কালাচাঁদ নামধেয় দুই ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই ব্রাহ্মণদ্বয় একান্নবর্ত্তী সহোদর। তারাচাঁদ জ্যেষ্ঠ ও কালাচাঁদ কনিষ্ঠ। তারাচাঁদের বিবাহ হইয়াছে, সম্প্রতি একটি পুত্রও জন্মিয়াছে, কিন্তু কালাচাঁদের অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই। ইঁহাদের নীলাম্বর নামধেয় একটি ভাগিনেয় ইঁহাদের সংসারভুক্ত ছিল। নীলাম্বর মাতুলাশ্রয়ে বাস করিত বলিয়া মাতুলদ্বয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল এবং উভয় মাতুলই ভাগিনেয় নীলাম্বরের প্রতি অতিশয় স্নেহপরবশ ছিলেন। ইঁহাদের সংসারে তারাচাঁদের স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীলোক ছিল না। সুতরাং তারাচাঁদের পত্নী পিত্রালয়ে গমন করিলে, হয় কালাচাঁদকে, না হয় নীলাম্বরকে রন্ধনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত।

কিছুদিন পরে কালাচাঁদের মৃত্যু হইল। কালাচাঁদের মৃত্যুকালে তারাচাঁদের স্ত্রী শিশুপুত্র ক্রোড়ে লইয়া পিত্রালয়ে ছিলেন; তাঁহাকে বাড়ী আনা অত্যন্ত আবশ্যক হইলেও, তাঁহার ক্রোড়গত শিশুপুত্রের একটা দারুণ ব্রণ ও তৎসংক্রান্ত জ্বর হওয়ায় শীঘ্র আসার ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। কালাচাঁদের মৃত্যুর ১৫ দিন পরে নিম্নলিখিত ঘটনা উপস্থিত হইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর, পৃথিবী জনসঞ্চারশূন্য। নীলাম্বর একক এক ঘরে নিদ্রিত। সেই নিঃশব্দ নিশায় কে যেন নীলাম্বরকে ডাকিল—"নীলু! নীলু!" নীলুর ঘুম ভাঙ্গিল, কিয়ৎক্ষণ কান পাতিয়া রহিল, কিন্তু আর কিছু শুনা গেল না। ভাবিতে লাগিল, আমায় কি কেহ সত্য সত্যই ডাকিল? না আমি স্বপ্ন দেখিলাম? কিয়ৎক্ষণ পরে নীলু বলিল, "কে ডাক?" নীলু

কোন মনুষ্যের সাড়া-শব্দ পাইল না বটে, কিন্তু কানে একটা শব্দ গেল—"তোমার ছোট মামা।" নীলু নিরক্ষর লোক, কিন্তু নির্ভীকস্বভাব। সে ভীত না হইয়া বলিল, "আমার ছোট মাম আজ ১৫ দিন মরিয়াছেন, কে তুমি ঠিক করিয়া বল।" এবার নীলু শুনিল—"ঠিক করিয়াই বলিতেছি, আমি তোমার ছোট মামা। আমার বড় ক্লেশ, বড় যাতনা, বড় অসহ্য পিপাসা।" নীলু বলিল, "বোধ হয়, তুমি ভূত, আমি তোমার কথায় উঠিব না, সম্মুখে নদী আছে, যত পার খাও গে।" ভূতযোনিপ্রাপ্ত কালাচাঁদ বলিল, "নীলু! তুই জানিস্ না, আমরা পানভোজনেও পরবশ, স্বাধীন নহি। তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি কালই বার জন ব্রাহ্মণকে শীতল পানীয় পান করাইবে, তাহাতে তাহাদের যে তৃপ্তি হইবে, সেই তৃপ্তিতেই আমার পিপাসা শান্তি হইবে।"

নীলু প্রভাত হইবামাত্র রাত্রের সংবাদ পাড়ায় এবং বড় মাতুলের নিকট প্রকাশ করিল এবং নারিকেল প্রভৃতি ভাল ভাল ফল যোগাড় করিয়া, খাওয়াইবার জন্য বার-তের জন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিল, ব্রাহ্মণেরা ঠাট্টা মনে করিয়া কেহই আসিলেন না। নীলুর আহৃত দ্রব্যাদি সমস্তই পড়িয়া রহিল।

দিন গেল, রাত্রি আসিল, নীলু ত' নিদ্রিত হইল। এমন সময় "নীলু! নীলু! নীলু!" এইরূপ ডাক শুনিতে পাইল। নীলু সচেতন হইয়া প্রত্যুত্তর করিল, "আমি সমস্তই যোগাড় করিয়াছিলাম, কিন্তু পাড়ার লোক সে-সকল খাইল না, তা আমি কি করিব?" অদৃশ্য প্রাণী বলিল, "প্রভাতে তুমি প্রত্যেককে

পুনর্ব্বার আহ্বান করিবে এবং বলিবে, যিনি খাইবেন না, রাত্রে ছোট মামা তাঁহার সহিত দেখা করিবেন।"

নীলু প্রভাতে তাহাই করিল, ব্রাহ্মণেরাও ভয়ে ভয়ে নীলুর দ্রব্য ভক্ষণ করিল, তথাপি অদৃশ্য প্রাণী পুনর্ব্বার অর্দ্ধরাত্রিসময়ে আসিয়া নীলুকে ডাকিল, নীলু বলিল, "আজ আবার কি?" অদৃশ্য প্রাণী বলিল, "আমার বড় কষ্ট; তুমি তোমার বড় মামাকে বল, শীঘ্র আমার জন্য গয়া গমন করুন, অমুক স্থানে কিছু টাকা আছে, তাহা তিনি তুলিয়া লউন এবং কল্যই গয়াযাত্রা করুন। তাঁহার সন্তানটি সে স্থানে ভাল আছে, ফোড়াটি গেলে দিয়ে এসেছি, তাহার জ্বরত্যাগ হইয়াছে; আজ সে ভাত খাবে। আমি প্রত্যহ তাহার সংবাদ বলিব, তোমাদের বাড়ী-ঘর রক্ষণাবেক্ষণ করিব এবং সমস্ত দিন তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া পুনর্ব্বার রাত্রে এখানে আসিব। যেদিন এ কষ্ট হইতে উদ্ধারলাভ করিব, সেই দিন কোন একটা চিহ্ন স্থাপন করিয়া যাইব,—বাটীর সম্মুখে এই যে বৃহৎ তালগাছটি আছে, এইটি ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইব। সে দিন দেখিবে, বৃক্ষটি বিনা বাতাসে ভাঙ্গিয়া গেল, সেই দিন বুঝিবে, তোমার ছোট মামার সদ্গতি হইয়াছে।"

অনন্তর নীলু প্রভাত আগতে অদৃশ্য প্রাণীর সমস্ত কথা বড় মাতুলের নিকট প্রকাশ করিল। তারাচাঁদ অদৃশ্য প্রাণীর নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিয়া একঘটি টাকা পাইলেন; টাকার কথা সত্য হওয়ায় তারাচাঁদের এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস হইল, তবে অন্যান্য সমস্ত কথাই সত্য। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া, পরদিন প্রাতেই গয়াযাত্রা করিলেন।

ভূত প্রতিদিন রাত্রে নীলুকে বলে, "আজ দাদাকে অমুক চটীতে রাখিয়া এলাম এবং বাটীর সংবাদ ও খোকার সংবাদ তাঁহাকে বলিয়া এলাম।"

নীলুর পুষ্করিণীর ধারে কতকগুলি কলার গাছ ছিল এবং একটি গাছে বৃহৎ এককাঁদি কলা হইয়াছিল, কোন দুষ্ট বালক তাহা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। রাত্রে অদৃশ্য প্রাণী তারাচাঁদের সংবাদ বলিতে আসিলে, নীলু বলিল, "আমার কলাগুলি চোরে লইল, তুমি তাহার কি করিলে?" অদৃশ্য প্রাণী বলিল, "আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি তুমি অমুকের নিকট কলাগুলি চাহিবে এবং বলিবে, কলা না দিলে রাত্রে ছোট মামার সঙ্গে দেখা হইবে।" পরদিন নীলু নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট গিয়া কলার কথা বলিল এবং সেই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিও ভয়ে কলাগুলি তৎক্ষণাৎ প্রত্যর্পণ করিল।

এদিকে তারাচাঁদ গয়ায় পৌঁছিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মে পিণ্ডদানাদি কার্য্য শেষ করিলেন এবং প্রত্যাগমনের জন্য পুনঃ উদ্‌যুক্ত হইলেন। যেদিন তারাচাঁদের কার্য্য শেষ হইয়াছিল, সেইদিন সন্ধ্যাকালে তারাচাঁদের সেই বৃহৎ তালগাছটি অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এই ঘটনা কিছু অধিক দিনের হইলেও গ্রামস্থ সকল লোকেই উক্ত ঘটনা অদ্যাপি জল্পনা করিয়া থাকে। ক্লেশসহিষ্ণু ভূতেরা উদ্ধারলাভের ইচ্ছায় সুহৃদ্‌স্বজনদিগের প্রতি উক্তপ্রকার বাক্‌প্রসঙ্গ করিয়া দৃষ্টির বাহিরে অবস্থান করে এবং কোন কোন ভূত পূর্ব্বমূর্ত্তিতে দেখা দেয়। মধ্যে মধ্যে এরূপ কথাও শুন যায় যে, কোন কোন ভূত দৌরাত্ম্য করিয়া স্বজনদিগকে

গয়াগমনে প্রবৃত্ত করায়। কোন কোন ভূত প্রিয়ব্যক্তিতে আবিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। আমরাও একটি ভূতাবিষ্ট রোগীর মুখে অনেক গুহ্যকথা শুনার পর "গয়া করাও, নচেৎ ছাড়িব না।" এ কথা বলিতে শুনিয়াছি।

ভূতেরা নানা অভিপ্রায়ে মনুষ্য প্রাণীতে আবিষ্ট হয়। কেহ বা কষ্ট দিবার জন্য, কেহ বা আপনার উদ্ধারকামনায়, কেহ বা পূর্ব্ববন্ধুদিগের উপকারার্থ এবং কেহ বা নিজের কৌতুকবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য আবিষ্ট হয়। তন্মধ্যে যাহারা কষ্ট দিবার জন্য আবিষ্ট হয়, তাহাদেরই আবেশ ভয়াবহ, অর্থাৎ তাহাদেরই আবেশে ঘোরতর রোগ জন্মে। প্রাচীন ভূতবিদ্যাবিশারদ ঋষিরা বলেন,—

"দর্পণাদীন্ যথাচ্ছায়া শীতোষ্ণং প্রাণিনো যথা।
স্বমণিং ভাস্করার্চ্চিশ্চ যথা দেহঞ্চ দেহভৃৎ।
বিশন্তি চ ন দৃশ্যন্তে ভূতাস্তাবৎ শরীরিণঃ॥"

যেমন দর্পণাদি পদার্থে প্রতিবিম্বের প্রবেশ, যেমন প্রাণিশরীরে শীতোষ্ণের প্রবেশ, যেমন সূর্য্যকান্তমণিতে (আতস পাথরে) সূর্য্যরশ্মির প্রবেশ, যেমন গর্ভগতদেহে দেহধারী জীবের প্রবেশ, তেমনি মনুষ্যপ্রাণীর শরীরে ভূতের আবেশ জানিবে। ভূতেরা যে কখন কোন্ সুযোগে ও কি প্রকারে মনুষ্যপ্রাণীতে আবিষ্ট হয়, মনুষ্য তাহা জানিতে পারে না। এখানে ভূত শব্দের অর্থ ভূতযোনি অর্থাৎ যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমস্তই অথবা অমানব সত্ত্ব বা অশরীরী জীব।

যেমন মনুষ্য এক জাতি, ইহার অবান্তরজাতি অনেক, তেমনি,

ভূত এক জাতি, ইহার অবান্তরজাতি অনেক। অপিচ, ভূতজাতীয় জীব সমস্তই যে তুল্য-ধর্ম্মা বা তুল্যস্বভাবসম্পন্ন, তাহা নহে। উহাদের মধ্যেও বিশেষ ভাব বা তারতম্য ভাব প্রচুর পরিমাণে আছে। উহাদের মধ্যে জ্ঞানী ভূত ও মূর্খ ভূত, শান্ত ভূত ও অশান্ত ভূত, সমস্ত ভেদই আছে, ইহা ভূতবিদ্যাবিশারদ-দিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ছাত্রাবস্থায় একটি ভূতাবিষ্টা রমণীর নিকট হইতে ভুবনকোষের পরিমাণাদি জ্ঞাত হইয়াছিলেন। সে বৃত্তান্ত বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে, মনঃপ্রত্যয়ের জন্য বৃহদারণ্যকের সেই অংশ উদ্ধৃত হইল।

"অথ হৈনং ভুজ্যুর্লাহ্যায়নিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ। মদ্রেষু চরকাঃ পর্য্যব্রজাম তে পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহান্ ঐম। তস্যাসীদ্ দুহিতা গন্ধর্ব্বগৃহীতা। তমপৃচ্ছাম কোঽসীতি। সোঽব্রবীৎ সুধন্বা আঙ্গিরস ইতি। তং যদা লোকানামন্তান্ অপৃচ্ছাম" ইত্যাদি।

যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের জন্য উদ্ধৃত শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ চলিত ভাষায় বলা যাইতেছে।—লাহ্যগোত্রীয় ভুজ্যুনামধেয় ঋষি, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ও উষস্ত চাক্রায়ণ প্রমুখ আরও কয়েকজন ঋষি ভুবনকোষের শেষ সীমা কোথায়, এই প্রশ্ন উত্থাপনপূর্ব্বক তন্মীমাংসার্থ পরস্পর স্পর্দ্ধমান হইতেছিলেন। তন্মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"আমরা অধ্যয়ন-ব্রতকালে মদ্রদেশে গিয়াছিলাম। তথায় পর্য্যটন করিতে করিতে শুনিলাম, কপিগোত্রীয় পতঞ্চল নামক ব্যক্তির গৃহে তদীয় কন্যা গন্ধর্ব্বগৃহীতা অর্থাৎ ভৌতিক আবেশবিশিষ্টা হইয়াছে। শুনিয়া আমরা

সকলেই তদীয় গৃহে গমন করিলাম এবং সেই ভূতাবিষ্টা কন্যাকেও দেখিলাম। পরে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? সে প্রত্যুত্তর করিল, আমার নাম সুধন্বা, আমি আঙ্গিরসগোত্রীয়। অনন্তর আমরা ভুবনকোষের পরিমাণ জানিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কথার প্রত্যুত্তর দ্বারা তিনি অর্থাৎ সেই গন্ধর্ব (অমানুষ সত্ত্ব) আমাদিগকে সমস্তই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ভুবনকোষবিষয়ক আমার জ্ঞান স্বর্গীয় সত্ত্বের নিকট লব্ধ, এ জ্ঞান তোমার নাই। তাহা না থাকায় তোমার পক্ষ অতি দুর্ব্বল---ইত্যাদি। উপনিষদের এই বর্ণনা ও শাস্ত্রান্তরের অন্যান্য বর্ণনা পাঠ করিবামাত্র মনে হয় ভূতযোনির মধ্যেও জ্ঞানী, অজ্ঞানী, পণ্ডিত, মূর্খ ও শঠ, সরল প্রভৃতি সমস্ত ভেদই আছে। থাকুক বা না থাকুক, প্রসঙ্গোক্ত ভূতযোনির কথা অধিক বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন, সেজন্য এই স্থানেই ঐ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম এবং পুনর্ব্বার প্রস্তাবিত বিষয়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বলা হইয়াছে যে, জীব মৃত্যুর পর কিছুকাল আতিবাহিক দেহে থাকে, পরে কর্ম্মবিপাকের নিয়মে চতুরশীতিলক্ষ প্রকার যোনির অন্যতম যোনিতে গিয়া উৎপন্ন হয়। এ পৃথিবীতে স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ এই চারি শ্রেণীর যোনি (উৎপত্তিস্থান) আছে ও তদ্ভিন্ন, অন্য লোকে অন্য প্রকার যোনিও আছে। পূর্ব্বের জ্ঞান, কর্ম্ম ও অভ্যাস অনুসারে সে সকলের একতমগামী হয়। "পিত্র্যং বা গান্ধর্বং বা দৈবং প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা অন্যেষাং বা ভূতানাম্" যে কেহ জন্মগ্রহণ

করুক, সকল জন্মেরই এক একটা ক্রম আছে। তন্মধ্যে মনুষ্যজন্মের ক্রম অনুসন্ধান ও তাহার বর্ণনা করা আমাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য। এই মনুষ্যজন্মই আমাদের পূর্ব্বজন্মের পরলোক, তথা ভবিষ্যৎ জন্মই আমাদের ইহলোক অপেক্ষা পরলোক। আমরা পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যদেহে আসিয়াছি। যে ক্রমে বা যে প্রণালীতে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি, সে ক্রমের বহু অংশ প্রত্যক্ষ; সুতরাং সে-সকল অংশ সাধারণের বিদিত। যে অংশ সাধারণের অবিদিত, সেই অংশই আমাদের আলোচ্য। আলোচনায় মুখ্য অবলম্বন শাস্ত্র, গৌণ অবলম্বন যুক্তি।

শুনিতে পাই, বহিরাকাশের বায়ুতে, জলে ও বিবিধ খাদ্যদ্রব্যে অসংখ্য জীবাণু বাস করে। সেই সকল জীবাণু প্রতিমুহূর্ত্তেই বায়ুর সঙ্গে, জলের সঙ্গে ও বিবিধ খাদ্যের সঙ্গে আমাদের শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছে। একথা এখনকার উন্নত বৈজ্ঞানিকদিগের, সেই জন্য অবিশ্বাস্য নহে। কোন ঋষি যদি ঐরূপ কথা বলেন, তাহা হইলে বোধ হয়, সেকথাও অবিশ্বাস্য হইবে না। ঋষিরাও বলিয়াছেন, অত্যন্ত সূক্ষ্মশরীরী জীব খাদ্যের সঙ্গে মনুষ্যশরীরে প্রবিষ্ট হয়। অন্তরালভোগ সমাপ্ত হইলে, কেহ বা স্বর্গনরকভোগের অবসানে, পুনঃ সূক্ষ্মশরীরে, শিশির, বৃষ্টি, জল ও বায়ু প্রভৃতিতে ভ্রমণ করিয়া ঐ সকলের দ্বারা শস্যগামী হয়, তৎপরে খাদ্যপ্রসঙ্গে মনুষ্যগামী হয়। স্ত্রীশরীরগামী হইলে আর্ত্তব রক্ত ও পুংশরীরগামী হইলে রেতোধাতু আশ্রয় করে। তৎপরে কর্ম্মবিপাকের নিয়মে মৈথুন-

ধর্ম্মের দ্বারা জরায়ুর মধ্যে সংযুক্ত রেতোরক্ত তাহার পুনঃ স্থূলশরীর গঠন আরম্ভ করে, এই আরম্ভের অপর নাম গর্ভসঞ্চার।

কেবল শুক্রশোণিতসংযোগ গর্ভারম্ভের কারণ নহে; তৎসঙ্গে জীবসংযোগ থাকা আবশ্যক। জীবসংযোগ ব্যতীত কেবল শুক্রশোণিত সংযোগে গর্ভসঞ্চার হয় না। ঋষি ধন্বন্তরি নির্দ্দোষ শুক্র, নির্দ্দোষ আর্ত্তব রক্ত ও নির্দ্দোষ সঙ্গমস্থলেও কদাচিৎ গর্ভোৎপত্তি হয় না দেখিয়া তৎসঙ্গে জীবের প্রবেশ অপ্রবেশ অনুমান করেন; তাই তাঁহার শিষ্য সুশ্রুত স্বকৃত শারীরশাস্ত্রে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন,—

"তত্র স্ত্রীপুরুষয়োঃ সংযোগে তেজঃ শরীরাৎ বায়ুরুদীরয়তি। ততস্তেজোঽনিলসন্নিপাতাৎ শুক্রং চ্যুতং যোনিমভি প্রতিপদ্যতে সংসৃজ্যতে চার্ত্তবেন। ততোঽগ্নিসোমসংযোগাৎ সংসৃজ্যমানো গর্ভো গর্ভাশয়মনুপ্রতিপদ্যতে ক্ষেত্রজ্ঞো চেতয়িতা স্পৃষ্টা ঘ্রাতা দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা পুরুষঃ স্রষ্টা গন্তা সাক্ষী ধাতা বক্তা যোঽসাবিত্যেব-মাদিভিঃ পর্য্যায়বাচকৈর্নামভিরভিধীয়তে দৈবসংযোগাৎ অক্ষয়োঽ-ব্যয়োঽচিন্ত্যো ভূতাত্মনা মহাত্মক্ষং সত্ত্বরজস্তমোভির্দৈবাসুরৈরপরৈশ্চ ভাবৈর্বায়ুনা অভিপ্রের্য্যমানো গর্ভাশয়মনুপ্রবিশ্য অবতিষ্ঠতে।"

অতএব শুক্রশোণিতযোগে জীবের গর্ভপ্রবেশ ধন্বন্তরি ঋষি ও তদীয় শিষ্য সুশ্রুতের অভিমত। সুশ্রুতাচার্য্য আরও এক কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন যে জীব, যে সঙ্গমের দ্বারা জরায়ু-প্রবিষ্ট হয়, জরায়ুপথে জীবের অনুপ্রবেশ হইল কি না, তাহা সঙ্গমের পরেই বিদুষী রমণীরা বুঝিতে পারেন এবং যে সঙ্গমে জরায়ুপথে জীবের প্রবেশ না হয়, সে সঙ্গমের পরেও তাহা তাঁহারা

বুঝিতে পারেন। উভয়েরই লক্ষণ পৃথক্। জীবপ্রবেশের বিস্পষ্ট লক্ষণ এই যে, জরায়ুপথে ও জরায়ুমধ্যে পিপীলিকা-সঞ্চরণের ন্যায় স্ফুরণ-বিশেষের অনুভব এবং অপ্রবেশের লক্ষণ সে প্রকার অনুভূতি না হওয়া। গর্ভসম্ভবের অপর লক্ষণ—সঙ্গমের পরেই সংযুক্ত শুক্র-শোণিতের অবরোধ এবং গর্ভ না হওয়ার লক্ষণ—সংযুক্ত শুক্র-শোণিতের প্রচ্যুতি। অবরোধ হইলে যোনিপথ শুষ্ককল্প এবং অবরোধ না হইলে পথের আর্দ্রতা বা ক্লিন্নভাব।

"শুক্রের সঙ্গে জীবের জরায়ুপ্রবেশ" এই কথায় হয়ত শুক্রস্থ কীটাণুর কথা মনে পড়িবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে শুক্র ধাতুতে যে একপ্রকার সূক্ষ্ম কীটাণু দেখা যায়, আমরা সে কীটাণুর কথা বলিতেছি না, ঋষিরাও তাহা বলেন নাই। ঋষিদিগের অভিপ্রেত সূক্ষ্মশরীরাবচ্ছিন্ন জীব অণুবীক্ষণে দৃষ্ট হয় না, বিশেষতঃ এক গর্ভে একটি মানুষ, কদাচিৎ দুইটি মানুষ জন্মে, পরন্তু শুক্রে কীটাণুর স্থিতি শত শত।

শারীরশাস্ত্রে লিখিত আছে, প্রথম মাসের গর্ভের অবস্থা কলল সংজ্ঞাপ্রাপ্ত, দ্বিতীয় মাসে সংঘাত বা ঘনীভাব এবং তৃতীয় মাসে হস্ত, পদ, মস্তক ও সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিভাগ নিষ্পন্ন হয়। চতুর্থ মাসে সেই সকল বিভাগ ব্যক্তভাব ধারণ করে এবং হৃদয়স্থান ব্যক্ত হওয়ায় চেতনাও তদনুরূপ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়। এই সময়ে ইচ্ছাও কিছু কিছু উদিত হইতে থাকে। পঞ্চম মাসে মস্তুনের স্ফূর্তি, ষষ্ঠমাসে বুদ্ধির রণ এবং সপ্তম মাসে সমুদয়

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নির্মাণ সমাপ্ত হয়। অষ্টম মাসে ওজোধাতুর অস্থিরতা থাকে। পরে নবমাদি মাসে অর্থাৎ দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এই চারির একতম মাসে সেই গর্ভ শরীরধারী হইয়া ইহলোকে আইসে। লোক শব্দের অর্থ ভোগস্থান ও ভোগযোগ্য শরীর, সুতরাং পরলোক শব্দের অর্থও পরবর্ত্তী শরীর। অতএব, পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগের পর অন্য এক নূতন শরীর উপরি উক্ত প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় "স্বভাব" এই উচ্চারণের একটা কথা আছে। এই কথা লইয়া কেহ কেহ জন্মান্তরবাদের প্রতিপক্ষ হন। কিন্তু তাঁহাদের সে প্রতিপক্ষতা পক্ষহীন। যাহাই হউক, কি অভিপ্রায়ে, কোন্ সময়ে কোন্ মহাপুরুষের মুখে ঐ শব্দ প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে জানা যায় না। তবে ভাষার নিয়ম বা ব্যাখ্যারীতি অনুসারে বুঝা যায়—যাহা আপন'-আপনি হয়, অথবা যাহার অবশ্যম্ভাব অন্যনিরপেক্ষ বা অনির্বাচ্য, তাহাই স্বভাব শব্দের অর্থ। স্ব—স্বয়ং অর্থাৎ আপনা-আপনি অথবা অন্যনিরপেক্ষভাবে এবং ভাব—হওয়া ও থাকা। 'স্বয়ং বা আপনা-আপনি হয়,' এ কথার অর্থে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, আমরা যাকে আপনা-আপনি হয় বলি, বস্তুতঃ তাহা আপনা-আপনি হয় না, তাহাও কারণপূর্ব্বক হয়। যেহেতু তাহা কারণ-কূটের মহিমায় হয়, সেই হেতু তাহা অন্যনিরপেক্ষ নহে; পরন্তু অন্যসাপেক্ষ। অন্যসাপেক্ষ অর্থাৎ কারণসাপেক্ষ। কেন না, বিনা কারণে কোন কিছু হয় না, এ নিয়ম সর্ব্ববিদিত। তন্মধ্যে যে-সকল কারণ অত্যন্ত দূরবর্ত্তী ও যৎপরোনাস্তি দুর্জ্ঞেয়, স্বভাব

শব্দ সেই সকল কারণপ্রচয়ের পরিভাষা মাত্র। তাই শঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যের অষ্টম অধ্যায়ের ৪১ এক চল্লিশ শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—"স্বভাবঃ ঈশ্বরস্য ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির্মায়া, অথবা জন্মান্তরকৃতসংস্কারঃ প্রাণিনাং বর্ত্তমানজন্মনি স্বকার্য্যাভিমুখ-ত্বেনাভিব্যক্তং স্বভাবঃ।" অতএব "অমুক প্রাণীর স্বভাব অমুক প্রকার," "অমুক প্রাণীর স্বভাব অমুক প্রকার", এ সকল স্বভাব সেই সেই প্রাণীর পূর্ব্বসংস্কারের উদ্বোধন বা উত্তেজনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। প্রাণিমাত্রেই অভ্যাসের বশ্য, ইহা এতজ্জন্মের অভ্যাস-দৃষ্টে অবধারণ করা হয় এবং এতজ্জন্মের অভ্যাস নাই, অথচ প্রাণী অদম্য প্রবৃত্তির বশ্য, অনিবারণীয় ঝোঁকের অধীন, ইহা দেখিয়া অনুমান করা হয় যে, প্রাণীর সেই সেই ভাব বা স্বভাব, তাহার পূর্ব্বাভ্যাসেরই অনুবৃত্তি। অতএব স্বভাব শব্দের দোহাই দিয়া পূর্ব্বাপরজন্মের অপলাপ করা যায় না এবং he law of natural selection, the law of the editory instinctive action, এই সকল ইংরাজী কথা প্রয়োগ করিলেও জন্মান্তরার্জ্জিত সংস্কারের অনুবর্ত্তন নিবারিত হয় না।

এই স্থানে আর দুইটি প্রাসঙ্গিক কথা বলা আবশ্যক বোধ করিলাম। চিকিৎসকেরা বলেন, শ্বাসক্রিয়ার ধ্বংস, মস্তিষ্কের কার্য্যরাহিত্য, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিনাশ, এই তিন উপলক্ষে জীবের মৃত্যু হয়। কাহার কোন্‌টি আগে হয়, তাহার স্থিরতা নাই, কাহারও বা আগে মস্তিষ্কের কার্য্য রহিত হইতে দেখা যায় এবং কাহারও বা আগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইতে দেখা যায়। অবশ্য, চিকিৎসকেরা বাহিরে যাহা

দেখেন, তাহাই বলেন; কিন্তু ঋষিরা বলেন, শ্বাসক্রিয়ার অর্থাৎ প্রাণকার্য্যের উপসংহার সর্ব্বশেষে হয়, মস্তিষ্কের কার্য্য রহিত হইলেও আত্যন্তিক জ্ঞানলোপ কোনও সময়ে কোনও জীবের হয় না। মস্তিষ্কের কার্য্য জ্ঞান, তাহার রাহিত্যে বাহ্যজ্ঞানের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু সংস্কারজনিত অন্তর্বিজ্ঞানের লোপ অবশ্যম্ভাবী নহে। ঋষিরা বলেন, জ্ঞানস্বভাব জীবের জ্ঞানবর্জ্জিত অবস্থা অসম্ভাব্য। ফল-কথা, মৃত্যুকালের জ্ঞান মৃত্যুপূর্ব্বের নিয়মে উৎপন্ন নহে। সুতরাং সে জ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক্।

পুরাকালে এ দেশে অনেক ভূতবিদ্যাবিৎ ঋষি ছিলেন। শুনিতে পাই, বিদ্যমানকালেও, অন্য ভূখণ্ডেও অনেক ভূতবিদ্যাবিশারদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত ঋষিদিগের মতবৈষম্য দেখা যায়। ঋষিদিগের মতে যাবৎ প্রেত-অবস্থা, তাবৎ তাহাদিগকে আহ্বান বা আকর্ষণ করা যায় এবং দেব-গন্ধর্ব্বাদি দেবযোনিপ্রাপ্তদিগকেও আকর্ষণ বা আহ্বান করা যায়। আবেশশক্তিও ঐ সকল প্রাণীতে বিদ্যমান থাকে। পরন্তু যে-সকল জীব মৃত্যুর পর মনুষ্য, পশু অথবা পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে পুনরুৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা আকৃষ্ট বা আহূত হইবার নহে। আকর্ষণ বা আহ্বান করিলেও তাহারা আসিতে পারে না এবং কোনও প্রাণীতে তাহারা আবিষ্ট হইতে পারে না। তাহারা তদুপযুক্ত জ্ঞানে ও শক্তিতে বঞ্চিত। ব্যাসদেব যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর যুদ্ধমৃত বীরদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সে সকল বীর তখন আতিবাহিকদেহী অথবা

দেবযোনিপ্রাপ্ত ; সুতরাং তাহাদের আহ্বান ও আগমন অসম্ভব নহে। শুনিতে পাই, বর্ত্তমানকালের ভূতবিদ্যাবিশারদেরা মৃতমাত্রকেই আহ্বান করিতে পারেন বা করেন ; এমন কি, বুদ্ধদেবের আত্মাকেও নাকি কোন পণ্ডিত আহ্বান করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ইঁহারা যোনিজন্ম বিশ্বাস করেন না। ইঁহাদের বিশ্বাস—যতই মরিতেছে, সমস্তই কোন এক লোকে অথবা দুই-তিন লোকে জমায়েৎ হইতেছে এবং নূতন নূতন জীব উৎপন্ন হইয়া তাহাদের স্থান পূরণ করিতেছে। ঋষিরা বলেন ও বিশ্বাস করেন, নূতন জীব জন্মে না, পুরাতন জীবই নূতনশরীরী হইয়া ইহলোকে আইসে ; আবার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে চলিয়া যায়। সেই লোকান্তরই তাহাদের পরলোক।

॥ সমাপ্ত ॥